Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/30	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1291b.s. (1884)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Printed by Bhubanmohan Ghosh, at Victoria Press, 210/1 Cornwallis Street.
Author/ Editor:	Sitanath Nandi	Size:	13x21cms
		Condition:	Brittle
Title:	Bangagriha	Remarks:	Fiction literature

Extreamly Brittle

Mary Carpenter Series.

মেরি কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলী।

বঙ্গগৃহ।

শ্রীসীতানাথ নন্দী বি, এ,

প্রণীত।

" চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।
যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম। "

কলিকাতা ;

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

ভূমিকা।

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, ভালও দেখায় না; কিন্তু কি করি, কিছু না বলিয়াও হঠাৎ পাঠকের হস্তে পুস্তক খানি দিতে সাহস হয় না। তাই ইহার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বঙ্গগৃহের একটি উদ্দেশ্য আছে—সে উদ্দেশ্যটি সাধারণ উপন্যাসের উদ্দেশ্য হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে অনেক গুলি ভীষণ দোষ ও নৃশংস অত্যাচার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একাধিপত্য করিতেছে, তাহাদের ঘোর অত্যাচারে বঙ্গবাসীর সুখ বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত অত্যাচারের একটি নৃশংসতম অত্যাচার অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইল। এই ঘোরতর অত্যাচারটি যথাযথ চিত্রিত করিয়া মানব হৃদয়ের স্বাভাবিকী সহানুভূতি উদ্বোধিত করিয়া ইহার সমূল বিনাশই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যদি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া একটি হৃদয়ও উত্তেজিত হয় এবং এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে আমার চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল মনে করিব।

যে ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া এ পুস্তক প্রণয়ন করিলাম, তাহা অলীক নহে। এই উপন্যাসটি দুইটি জীবন্ত ঘোর অত্যাচারের ছায়ামাত্র—বস্তুতঃ এতদুভয় প্রকৃত ঘটনার সমবায়েই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। ছায়া অপেক্ষা মূল ঘটনা অধিকতর দুঃখবহ—প্রকৃত ঘটনার নায়িকাদ্বয় অধিকতর অত্যাচার প্রপীড়িতা। উপন্যাসের নায়িকার প্রতি অত্যাচারের এক দিন শেষ হইয়াছে কিন্তু জীবন্ত নায়িকাদ্বয়ের প্রতি অত্যাচারের শেষ নাই—যত দিন না তাহাদের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয় তত দিন তাহার শেষ হইবে না। গ্রন্থের নায়িকার পিতার মুখে যে কথা গুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার একটীও আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। কথাগুলি যেরূপ অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃত।

বঙ্গগৃহে অপর একটি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে—ইহার অস্তিত্ব আমি আমাদের সমাজে পাই নাই—ইহা আমার কল্পনার শান্তি নিকেতন। যেরূপ হইলে বঙ্গ গৃহ সকল সুখের আলয় হয়—ইহা তাহারই একটি চিত্র মাত্র।

এ পুস্তকে কেহ সমাজের গূঢ় চিত্র দেখিতে পাইবেন না—মানব হৃদয়ের গূঢ়তম ভাবের বিকাশ দেখিতে পাইবেন না—চিত্তরঞ্জনোপযোগী সুন্দর গল্প বিন্যাস দেখিতে পাইবেন না—ইহাতে একটি ভীষণ সামাজিক অত্যাচার বিবৃত হইয়াছে—ইহাতে হৃদয়বান্ ব্যক্তির অশ্রু বিসর্জ্জনের জন্য একটি অত্যাচার পীড়িতা দুঃখিনী বালিকার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

গ্রন্থের নাম বঙ্গগৃহ রাখা হইয়াছে—এতদ্দ্বারা কেহ যেন না মনে করেন যে বঙ্গগৃহে সকলই অত্যাচার—কিছুই ভাল নাই। তবে অত্যাচার চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার।

বঙ্গগৃহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জেলা—র অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে একটি কায়স্থ পরিবার বাস করিতেন। গ্রামের প্রান্ত দেশে একটি বিমল সলিলা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। তাহাদের গৃহ এই নদীর তীরেই অবস্থিত। গৃহটি ক্ষুদ্র, চতুর্দ্দিকে আম, জাম, নিচু, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল পুষ্পে শোভিত বৃক্ষশ্রেণী মস্তক উন্নত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যেন সেই গৃহের শান্তি রক্ষা করিতেছে। তাহাদের ডালে ডালে নানা জাতীয় পক্ষীগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছে। তাহাদের গানে বাগানটি প্রায় সর্ব্বদাই শব্দায়মান। এই বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ—লতাকুঞ্জের চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় দেশী বিলাতী পুষ্প বৃক্ষ বাগানের শোভা আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এই লতাকুঞ্জের মধ্যে বসিলে কুসুম পরিমল বাহী পবনের মৃদু সঞ্চালনে শরীর পবিত্র হয়, বিহঙ্গের গানে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। বাটীর দক্ষিণ দিকে একটি সুবিস্তৃত পরিষ্কার নয়নাভিরাম ময়দান। গৃহটি ও তৎসন্নিবিষ্ট বাগান এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে তুলনায় রাজ প্রাসাদও তাহার নিকট মস্তক অবনত করে। তাহাতে স্থানটি এমন নির্জ্জন যে সেখানে উপস্থিত হইলেই ভাবুকের মন শান্তিরসে পূর্ণ হইয়া যায়।

এই পরম রমণীয় স্থানে নদীর তীরে লতাকুঞ্জের মধ্যে দুইটী

বালিকা বসিয়া এক মনে কি করিতেছে? পাঠক! মর্ত্ত্যে স্বর্গের শোভা দেখিবেন? তবে আসুন। বালিকা দুইটীর একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া, অপরটী দশম বর্ষীয়া। তাহাদের বেশের কিছু মাত্র পারিপাট্য নাই। হাতে বালা ও পরিধানে মোটা কিন্তু পরিষ্কার বস্ত্র, চুল আলুলায়িত। বস্ত্রও পরিপাটি রূপে পরা নাই, অঞ্চল ক্রোড় দেশে স্তূপীকৃত রহিয়াছে, শরীরের উপরার্দ্ধ অনাবৃত। চুল আলুলায়িত বটে কিন্তু বিবিদিগের ন্যায় অতি যত্নে দোলায়মান চামর তুল্য পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত নহে। ইহাতেও বিশেষ যত্নের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। চুল গুচ্ছ গুচ্ছ হইয়া তাহাদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গই আবরণ করিয়াছে—পৃষ্ঠদেশে গাঢ়তম ক্রমশঃ পাতলা হইয়া কপোল দেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কেশ রাশির অন্তরাল দিয়া চক্ষু দুইটি দেখা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠার চক্ষুতে চঞ্চলতা নাই, বিলাসের আবিলতা নাই—ইহা নির্ব্বাত প্রদেশের দীপ শিখার ন্যায় নিশ্চল, এ চক্ষু স্থির স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করে কিন্তু বায়ু সঞ্চালিত দীপশিখার ন্যায় আলোকে আঁধারে মিশাইয়া কদাচ কাহারও দৃষ্টিভ্রম ঘটায় না। পাঠক! আপনি যদি সরলতার উপাসক হন্ তবে অগ্রসর হউন, দেখিবেন ও চক্ষু হইতে কিরূপে করুণা মাখান সরলতা স্রোত বাহির হইতেছে, দেখুন ও চক্ষু দুইটি কি ভাবে আপনার মুখের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। আপনি এখনও ওই চক্ষু দেখিতেছেন কিন্তু ও চোকের ভাব এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই—উহা এখনও ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আপনার দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে। পাঠক! যদি আপনি এই স্থির দৃষ্টি অপেক্ষা চঞ্চল কটাক্ষ দেখিতে ভাল বাসেন তবে আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আর যদি সরলতা চান্ তবে এখনও ঐ চক্ষু দেখুন, দেখিবেন উহার ভাব এখনও অপরিবর্ত্তিত।

কনিষ্ঠার চক্ষু কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জক। ইহা এক উজ্জ্বল জ্যোতি বিশিষ্ট—সর্ব্বদাই ক্রীড়াশীল। চক্ষু দুইটি সর্ব্বদাই নাচিয়া নাচিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে—দেখিলেই মনে হয় যে যে হৃদয় এ চক্ষুতে প্রতি ফলিত হইয়াছে তাহা যেন কদাচ সংসারের কোনও কঠিন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে নাই —যেন এ হৃদয় চিরকালই হাসিয়া খেলিয়া কাটাইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এ চক্ষুতে বিলাস বা কুটিলতার লেশ মাত্র নাই, কেবল আভ্যন্তরিক জীবনী শক্তির ক্রীড়া ব্যঞ্জক চাঞ্চল্যই যেন ইহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তাহাদের সম্মুখে অনেক গুলি ফুল। দুই ভগিনীতে পা ছড়াইয়া বসিয়া এক মনে মালা গাঁথিতেছে ও সেই নির্জ্জন স্থানের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দুইটি কচি গলা মিশাইয়া গাহিতেছেঃ——

রাগিণী খট্।—তাল ঝাঁপ তাল।

"আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে দেখাও মোদের সবে
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটী ভীষণ।
ক্ষুদ্র আমাদের পরে, করিও না রোষ,
স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ।
শত বার লও তুলে, শত বার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন।
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব! মোদের ভবন
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল শরণ।

একবার ভ্রম হলে, আর কি লবে না কোলে,
একেবারে দূরে তুমি করিবে গমন ?
তা'হলে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমি তলে চিরদিন রব অচেতন।"

বৈশাখ মাসে দিবসের মধ্য ভাগে দুইটি বালিকা এইরূপে ঐ মনোহারিণী লতাকুঞ্জে বসিয়া গান গাহিতেছে। দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে সমস্তই নিরব, মধ্যে মধ্যে ঘুঘু প্রভৃতি বিহঙ্গম হরিৎ বৃক্ষ পত্রের অভ্যন্তর হইতে অস্ফুটস্বরে প্রকৃতির সজীবতার প্রমাণ দিতেছে। মধ্যে মধ্যে চাতকের কণ্ঠ সুমধুর তারস্বরে গগন ভাসাইতেছে সেই সঙ্গে মিশিয়া বালিকার কচি গলা জগতে পবিত্রতা ছড়াইয়া দিতেছে। প্রকৃতি দেবী নিস্তব্ধ ভাবে এক মনে সেই গান শুনিতেছেন। প্রকৃতির প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক ফুল হইতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাহাদের বদন মণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। অথবা তাহাদেরই মুখ মণ্ডল হইতে সৌন্দর্য্য স্রোত বাহির হইয়া প্রকৃতিকে মহিমান্বিতা করিয়াছে।

মালা গাঁথা শেষ হইলে পর জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে সাজাইতে বসিলেন। সেই আলুলায়িত কেশ রাশি যেরূপ অযত্ন বিক্ষিপ্তাবস্থায় তাহার পৃষ্ঠে, স্কন্ধে ও কপোলে বিন্যস্ত ছিল সেই অবস্থাতেই তিনি ফুলের মালা দিয়া তাহা শরীরের সহিত জড়াইয়া দিলেন। তাহাতে মুখ মণ্ডল শ্বেত কৃষ্ণ বিমিশ্রিত চূর্ণ মেঘজালাচ্ছাদিত চন্দ্রের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তিনি যেখানে যে ফুল দিলে শোভা পায় তাহা দিয়াই সাজাইলেন। তখন কনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদি, দাদার ছুটী হবে কবে ?" জ্যেষ্ঠা বলিলেন "শীঘ্রই হবে।"

এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন "বাড়ী কে আছে গো ? পত্র আছে।" তখন উভয়েই "দাদার পত্র এসেছে গো" বলিয়াই অঞ্চল যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে দৌড়াইলেন। যাইয়া হরকারার হস্ত হইতে পত্র লইয়া প্রফুল্লমুখে "মা, দাদার পত্র এসেছে" বলিয়া দৌড়াইয়া একেবারে মাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

আহা! বিদেশস্থিত প্রিয় ভ্রাতার পত্র পাইলে স্নেহশীলা ভগিনীর প্রাণে যে কি পবিত্র স্নেহের উৎস ফুটিয়া উঠে, কি আনন্দস্রোতে প্রাণ ঈষৎ কাঁপিতে থাকে তাহা বর্ণনা করা ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা কখনও এমন সুখ অনুভব করিয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কি অপরিমিত সুখ।

এদিকে মাতা শিশু সন্তানটিকে কোলে লইয়া মহাভারতের সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িতেছেন এবং অশ্রুজল তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ সতীশের পত্র আসিয়াছে শুনিয়া একেবারে উঠিয়া পত্র লইয়া পড়িতে বসিলেন। মাতার চক্ষে জল দেখিয়া উভয়ে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা, তুমি কাঁ'দছিলে কেন ?' মাতা বলিলেন 'মহাভারত পড়ছিলেম।' এ উত্তর শুনিয়া উভয়ে আশ্বস্তা হইলেন। মাতা গিরিবালাকে পুষ্পময়ী দেখিয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন 'মা, তুমি কি বনদেবী ?' গিরিবালা সলজ্জমুখে, হসিত কপোলে যাইয়া মাতার গলা বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, ধীরে মাতার মুখ চুম্বন করিলেন। মাতা গিরিবালাকে স্নেহময় বক্ষে টানিয়া লইলেন, তাহার মুখ চুম্বন করিলেন কিন্তু মুখ আর উঠিল না। দুই মুখ একত্র সম্বদ্ধ রহিল। উভয় হৃদয় স্ফীত হইল, উভয় হৃদয় তাহা অনুভব করিল। সংলগ্ন কপোলপথে যেন এক দেহের রক্ত

অপর দেহে বহিতে লাগিল, উভয় প্রাণ মিশিয়া গেল। মূর্খ মানব! মনে করিতেছ কি কেবল শরীর সংলগ্ন হইয়াছে? চক্ষু থাকে ত দেখ উভয় প্রাণে কিরূপ স্রোত বহিয়াছে, স্পর্শ শক্তি থাকে ত অনুভব কর প্রাণের গতি জনিত ঘর্ষণে শরীর কিরূপ উত্তপ্ত হইয়াছে। এখনও কি বলিবে যে চুম্বন কেবল শারীরিক ক্রিয়া? কখনই নহে—ইহা আত্মার পবিত্র মিলন।

মাতা তখন একেবারে গলিয়া গেলেন, অপত্য স্নেহ তাঁহাকে অভিভূত করিল, নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। কেবল এক মাত্র ভাব যেন জগতে বিরাজ করিতেছে—অন্যান্য কেবল ছায়া মাত্র। মাতা কন্যার সংলগ্ন কপোলের সেই ঢলঢল ভাব দেখিলে, সেই জগত প্রাণের আবির্ভাব দেখিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় না ভক্তিরসে বিগলিত হয়, কোন্ দেবতা পূজা না করিয়া থাকিতে পারেন!

কিয়ৎকাল এইরূপে অবস্থিতি করিয়া সতীশের পত্র পড়িতে লাগিলেন:—

মা, আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইবে। ছুটী হইলে আর এখানে আমি মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিব না। কলিকাতার গাড়ীর শব্দ ও ধূলা আমার আর সহ্য হয় না। কবে আবার আমি তোমার স্নেহময় বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইব! সেই সুখের দিন কল্পনা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ভাসিতেছে, পড়া শুনা আমার ভাল লাগিতেছে না। মা, নরেশ কেমন আছে? আমি তাহাকে কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি ভাল আছি, তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিবে।

তোমার সতীশ।

ভগিনী দুইটির নামেও সতীশের একখানা পত্র ছিল।

তাঁহারা দুই ভগিনীতে পত্র লইয়া পুনরায় তাহাদের লতাকুঞ্জে চলিয়া গেল। সতীশ শীঘ্র বাটী আসিবে এই সংবাদ আজ পরিবারের মধ্যে যেন নূতন প্রাণ ছড়াইয়া দিল। সকলেরই মন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মাতা সতীশ বাটী আসিলে কিরূপে তাহার সুখ বর্দ্ধন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া গৃহ কর্ম্ম সারিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সতীশের পিতা হরকুমার রায় অতিশয় ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। লেখা পড়াও প্রচুর পরিমাণে জানিতেন। তিনি যৌবন কালে পিতৃ মাতৃ হীন হন্, পরিবারে লোকজন আর ছিল না—কেবল মাত্র স্ত্রী সুতরাং বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি বাটী আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিজগ্রামের অনতি দূরে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল। তাহার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি হওয়াতে তিনি সেই পদে নিযুক্ত হন। এই রূপে তাঁহার সংসার যাত্রার এক প্রকার সুব্যবস্থা হইল। তিনি নিজে ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নির্জ্জন স্থান তাঁহার নিকট অতীব আদরের জিনিষ। তজ্জন্য তিনি গ্রামের অভ্যন্তরস্থ বাটী বিক্রয় করিয়া আসিয়া নদীতীরে কতক সাহেবী কতক বাঙ্গালী গোচের এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতেন।

সতীশের মাতা বাল্যকালে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; পরে স্বামীর সাহায্যে এবং নিজের অধ্যবসায় ও স্বাভা-

বিকী প্রতিভা বলে শীঘ্রই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কোমল হৃদয়া। সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক স্বামীর সহবাসে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার সমস্ত গুণের অধিকারিণী হইয়া উঠিলেন। সম প্রকৃতি সম্পন্ন দুইটি আত্মা একত্র থাকাতে আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্য্য নিয়ম বলে তাঁহারা এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ হইয়া গেলেন যে সংসারের কোন বস্তুই আর তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহটি মুনির তপোবনের ন্যায় শান্তি পূর্ণ। ক্রমে তাঁহাদের এই অতুল প্রেমের পাঁচটি অমূল্য ফল ফলিল। এগুলি তাঁহাদের পবিত্র প্রেমের জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ।

সতীশ নিকটস্থ এণ্ট্রান্স স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা মাসিক বৃত্তি পান। পরে কলিকাতার মেট্রপলিটান কলেজ হইতে এল্, এ পরীক্ষা দিয়া ২০ টাকা বৃত্তি পান এবং এখন সেখানেই বি, এ পড়েন। সুরবালা ও গিরিবালা পিতা মাতার যত্নে গৃহে বসিয়া বেশ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। গিরিবালার পর একটী পুত্র সন্তান জন্মে কিন্তু সে অতি অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। সর্ব্ব কনিষ্ঠ নরেশ—দুই বৎসরের শিশু। একবৎসর হইল জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া হরকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। তখন তাহাদের আত্মীয়েরা সতীশের মাতাকে গ্রামের প্রান্তস্থ গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু যিনি স্বরক্ষিতা ও ঈশ্বর কৃপায় অটল বিশ্বাসিনী তাঁহার আবার ভয় কি? তিনি তাহাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বামীর প্রিয় গৃহে হৃদয়ের অন্তঃপুরে

স্বামীকে পূজা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। যে স্বাধীন চিন্তা ও ঈশ্বরে নির্ভর হরকুমার রায়কে উত্তেজিত করিত তাহা পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভালবাসার শাসন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শাসন এ পরিবারে স্থান পাইত না। সকলের প্রাণের মধ্যে সেই একই স্বাভাবিকী স্বাধীনতা, একই স্বাভাবিকী ভালবাসা স্রোত প্রবাহিত হইত। একটু আঘাত পাইলেই অমনি এই স্বাধীনতা ও ভালবাসা উথলিয়া উঠিত; চোক মুখ দিয়া ফুটিয়া পড়িত। সন্তান গুলি এক একটি স্নেহ পুত্তলি। হরকুমার রায়ের এই সুখময় পরিবার নিকটবর্ত্তী লোকের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুরবালার গিরিবালা ভিন্ন অপর একটি সঙ্গিনী আছে। তাহাদিগের একঘর প্রতিবেশী ছিল। তাহারা দত্তবংশীয়। রামগোপাল দত্তের সরোজিনী নামে সুরবালার সমবয়স্কা একটি কন্যা ছিল। সরোজিনী বাল্যকালাবধিই সুরবালার সহিত এক সঙ্গে খেলা করিতেন, দিবসের অধিকাংশ সময়ই সুরবালাদের বাটীতে কাটাইতেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। সুরবালার পিতা মাতা তাহাকে নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বস্তুতঃ সরোজিনীকে দেখিলে স্নেহ না করিয়া থাকে কাহারও সাধ্য ছিল না। সতীশ যখন বাড়ী থাকিতেন তখন সুরবালা ও সরোজিনী উভয়েই তাহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। বাস্তবিক

তাহাদিগকে দেখিলে কেহ সহোদর সহোদরা ভিন্ন অপর কিছুই অনুমান করিতে পারিত না। সতীশ সুরবালার নিকট যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতেন তাহাতে সরোজিনীর বিষয়েও লেখা থাকিত।

অদ্য যখন সরোজিনী সুরবালার নিকট আসিলেন তখন তাহার মুখ দেখিয়াই মনে করিলেন যে নিশ্চয়ই একটি সুসমাচার পাইবেন। কারণ সতীশের পত্র পাওয়া অবধি তাহার মন আনন্দে উছলিয়া পড়িতেছে। কেবল দাদাকে জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিতেছেন। আহা! ভ্রাতা ভগিনীর কি অপূর্ব্ব ভালবাসা!

সরোজিনীকে দেখিবামাত্র এ সুখের সংবাদ না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া বলিলেন "সরো, দাদা পত্র লিখেছে, শীঘ্র বাড়ী আস্‌বে, দেখ্‌বি আয়। এ সংবাদে সরোজিনীও অত্যন্ত সুখী। দ্বিরুক্তি না করিয়া সুরবালার সহিত সতীশের পত্র দেখিতে গেলেন। সুরবালা ঘরে যাইয়া তাহার ক্ষুদ্র হাতবাক্সটি খুলিয়া পত্র খানা বাহির করিয়া সরোজিনীর হাতে দিলেন, সরোজিনী পড়িতে লাগিলেন!——

প্রাণের সুরবালা ও গিরিবালা,

আমার প্রাণ তোমাদের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমার চারি দিকে সকলই জীবন বিহীন। কলিকাতার সর্ব্বত্রই পোড়ামাটি, একটু কাঁচামাটি দেখাও অদৃষ্টে বড় ঘটিয়া উঠে না। নানা বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী ও খোলার ঘরে সহর পরিপূর্ণ। রাস্তাগুলি ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত। গাছ ত নাই বলিলেই হয়, যে গুলি আছে তাহাও আবার এরূপ ধূলি আচ্ছাদিত যে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ ঘৃণার উদ্রেক হয়। স্বভাবের সঙ্গীতের মধ্যে গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ আর লোকের চিৎকার! সহরে লোকের সংখ্যা করা যায় না। এখানে এক এক গলিতে যে লোক আছে আমাদের দেশে ৫। ৭ গ্রাম খুঁজিলেও তাহা মিলে না। কিন্তু কেবল লোকমাত্র, কাহারও মধ্যে প্রাণ খুঁজিয়া পাইলাম না। সকলেই প্রায় হয় অর্থোপার্জ্জনে না হয় বিদ্যোপার্জ্জনে ঘুরিতেছে। তাহাদের সহিত আলাপ করিতে হইলেই সংসারের শুষ্ক কথা ভিন্ন উপায় নাই। দুইটা হৃদয়ের কথা বলিয়া প্রাণঠাণ্ডা করিব এমন সঙ্গী বড় নাই। তাহাতে আবার আমরা থাকি বাসায়। আমাদের দুর্দ্দশার পার নাই। নানা স্থানের নানা প্রকৃতির ছাত্রেরা আসিয়া এক সঙ্গে থাকে ইহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রকারের জানোয়ার পাওয়া যায়। সকলেই মাতা ভগিনীর সংসর্গে বঞ্চিত। এইরূপে ইহাদের শুষ্ক জীবন আরও শুষ্ক হয়। ইহাদিগের সংসর্গ অপেক্ষা বিজন প্রার্থনীয়। স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ উভয়ের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অদ্য সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা তোমাদিগকে বলিব।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে কেবল শারীরিক বৈষম্য আছে তাহা নহে। মানসিক বৈষম্যও বিস্তর। পুরুষ সাধারণতঃ বীর্য্যশালী, উৎসাহী, কঠিন হৃদয় ও রাগ প্রবণ, অপর পক্ষে স্ত্রীলোক ভীরু-স্বভাবা, অল্পে সন্তুষ্টা, কোমলহৃদয়া এবং দয়ামমতার অনন্ত প্রস্রবণ। পুরুষ দৃঢ়তার প্রতিমূর্ত্তি, অপর পক্ষে স্ত্রীলোক মধুরতার প্রতিকৃতি। উভয়েই প্রভুত্ব প্রয়াসী—পুরুষ বাহুবলে পরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া প্রভুত্ব করিতে চায় কিন্তু স্ত্রীলোক পরের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়া ভালবাসা দ্বারা নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এইরূপে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুষ মনুষ্য সংসর্গ প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরে থাকিতে চায় কিন্তু স্ত্রীলোক

মনুষ্যদিগকে একত্রে আনিয়া ভ্রাতৃত্ব সূত্রে বন্ধন করে। অথবা সমাজের মধ্যে একটি আকর্ষণ, অপরটি অপকর্ষণ। আমি ইহা বলি না যে পুরুষের মধ্যে স্ত্রীসুলভ গুণ নাই বা স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষের গুণ নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরেই সমস্ত গুণের বীজ নিহিত রহিয়াছে, কেবল বিকাশ সাপেক্ষ। পুরুষের মধ্যে যে যে গুণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় আমি তাহাদিগকেই পৌরুষ গুণ বলিয়াছি আর স্ত্রীজাতির মধ্যে যে যে গুণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে স্ত্রৈণ গুণ বলিয়াছি। উভয়ের সংসর্গে উভয়ের এই সমস্ত অর্দ্ধ বিকশিত বা অবিকশিত গুণ সমূহ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যকে পূর্ণ করিবে। ইহাই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই জন্যই স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ একান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রচলিত না থাকাতে আমাদের দেশের এত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, এই জন্যই আমাদের নৈতিক অবস্থা এত হীন। যে দিন মনুষ্য এই পবিত্র সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহা প্রচার করিবে সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে, মনুষ্য দেবতা হইবে।

কিন্তু কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে? কেবল স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে মিশিলে, একত্র বেড়াইলে বা আহার করিলে পরস্পর পরস্পরের গুণাবলি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার সমস্ত বিষয়ই আমাদের নিকট এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, তাহার সমস্তই আমরা ভালবাসি। ভালবাসার এই অপূর্ব্ব মহিমা বলে যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহার ন্যায় হইতে ইচ্ছা করি, অথবা ইচ্ছা না করিলেও, প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়মানুসারেই আমরা তদনুরূপ হইয়া যাই। অতএব মর্ত্ত্যে এই স্বর্গের মহিমা আনিতে বাসনা করিলে

আমাদের অন্তরে এই আত্মার পবিত্র ভালবাসা থাকা একান্ত আবশ্যক। মাতা ভগিনীর বিমল স্নেহরাশি এইরূপে পুরুষের পঙ্কিল আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। হায়! কত শত হতভাগ্য মনুষ্য মাতা ভগিনীর এই বিমল স্নেহে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হৃদয় হইয়া জীবন্মৃত হইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তাকে ধন্যবাদ যে আমি এ সুখে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী! আমার এই স্নেহ স্রোতস্বিনী বিমল প্রবাহে কেমন তোমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত রহিয়াছে! হায়! কবে তোমাদিগকে নিকটে পাইয়া এই স্নেহবারি পান করিয়া হৃদয়ের এ দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিব! অনেক সময় বড় কষ্ট হয় কেন আমি শরীর বিশিষ্ট হইলাম! কেন আমি কেবল আত্মা হইলাম না? তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে যাইয়া আমার সকল বাসনা তৃপ্ত করিতাম। আমাদের শরীর ত মিশিয়া যায় না! এ বড় যন্ত্রণাদায়ক! যদি আমরা শরীর বিহীন আত্মা হইতাম তাহা হইলে কেমন মিশিয়া এক হইয়া যাইতাম। হায়! কবে আমাদের এমন অবস্থা হইবে!

তোমরা কেমন আছ সত্বর লিখিবে। সরোজিনীকে আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী
ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী
সতীশ——

পত্র পড়িতে পড়িতে তাহাদের অন্তরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল; সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, উত্তপ্ত রক্ত স্রোত আসিয়া কপোল, গণ্ড, কর্ণ, ললাটদেশ আরক্তিম করিয়া তুলিল; চক্ষু স্বচ্ছ বলিয়া ঐ দিকেই স্রোতের গতি প্রবল হইল, আনন্দের স্নিগ্ধ, বিমল অথচ তীক্ষ্ণ জ্যোতি স্বচ্ছ চক্ষুর অভ্যন্তর

দিয়া দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু স্রোতের সমস্ত বেগ বিফল হইল, শরীরাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারিল না। এই রুদ্ধ বেগ পরাস্ত হইয়া অবশেষে ভূকম্পনের ন্যায় শরীর বারম্বার কম্পিত করিয়া ক্ষান্ত হইল।

ভাই বঙ্গবাসী! তোমার হৃদয়ে কি এ ভ্রাতৃস্নেহের উচ্চতা ও গভীরতা অনুমিত হয়? তুমি কি তোমার ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পার? তাহা হইলে কেন তুমি তাহাকে ভোজ্যান্নের ন্যায় উৎসৃষ্ট কর? কেন তুমি তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তির কণিকা মাত্র দানেও মুখ বিকৃত কর? কেন তুমি তাহাকে সচ্চরিত্রই হউক আর অসচ্চরিত্রই হউক যাহার ইচ্ছা তাহার হস্তে প্রদান করিয়া তাহার চিরজীবনের সুখাপহরণ কর? না ভাই, কপটতা করিও না। তুমি এ ভালবাসার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিশ্বাস কর না। বিশ্বাস করিলে কদাচ এরূপ কার্য্য করিতে পারিতে না। আর না, মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না। একবার জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, যেখানে মনুষ্যমাত্রের স্বাধীনতা আছে, যেখানে পবিত্রতার আদর আছে এমন সুসভ্য জাতিদের প্রতি নয়নক্ষেপ কর; দেখিবে এমন ভালবাসার কত শত শত দৃষ্টান্ত বিরাজমান রহিয়াছে, দেখিবে কত কত ডরথি ও উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিতেছেন!

আজ তাহারা দাদার এই স্নেহপূর্ণ পত্র, দাদা কবে বাটী আসিবে, কিসে দাদার সুখ বাড়িবে, এই সমস্ত বিষয় লইয়াই দিন কাটাইলেন, অন্য কোনও চিন্তা তাহাদের অন্তরে স্থান পাইল না। আজ জগত তাহাদের চক্ষে এক নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে। যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাই সুন্দর, তাহাই স্নেহময়। আজ সকলের কথাতেই যেন দাদার স্নেহ মাখান রহিয়াছে। আজ সমস্ত সংসার দাদাময়! বিকালে যখন তিনজনে বাগানে বেড়াইতে গেলেন তখন পাখীর স্বর বেশী মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা দাদার কথাই বলিতেছে; ফুলেরা যেন কি কথা কহিতেছে সে যেন দাদার কথা! আজ তাহারা পাখীর কথা, ফুলের কথা বুঝিতে পারিতেছে। আজ তাহাদের মনের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির মুখে পড়িয়া কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে! ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তাহারাও বাগান হইতে গৃহে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী গৃহে যাইয়া দেখেন যে প্রায় সকলেই ব্যস্ত। প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে ঘরের দুয়ারে যাইয়া দেখেন যে দুই জন ভদ্রলোক জলযোগ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় তাহার মাতা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া নিবারণ করিয়া বলিলেন "করিস্ কি?" সরোজিনী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন, কি হইয়াছে?' তাহার মাতা উত্তর করিলেন "উঁহারা তোকে দেখ্‌তে এসেছেন।"

এ "দেখ্‌তে আসা" যে সে দেখ্‌তে আসা নয়। বঙ্গ সমাজে ইহার অতিশয় গূঢ় অর্থ রহিয়াছে। এই 'দেখ্‌তে আসার' উপর সহস্র সহস্র হিন্দু বালক বালিকার চিরজীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। কত শত শত বালক বালিকার পক্ষে এ দিন কি ভয়ানক, তাহাদের চিরজীবনের আশা ভরসা, সুখ এই দিনে জন্মের মত

বলি দেওয়া হয়। পাঠক! একবার অনুধাবন করিয়া শ্রবণ করুন, শুনিতে পাইবেন কি ভয়ানক অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে, শুনিতে পাইবেন কত শত অসহায়া মর্ম্ম পীড়িতা হিন্দু রমণী এই দিনকে অভিসম্পাত করিতেছেন। তাহারা অন্তঃপুর নিবদ্ধা, নির্ব্বাক্ তাহাদের দুঃখ কষ্ট কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না। তবে বিশেষ মনোনিবেশ করিলে মধ্যে মধ্যে সেই দমিত কাতরোক্তির গোঁ গোঁ শব্দ শুনা যায় মাত্র।

সরোজিনী আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সরিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। আজ সরোজিনী একটি নূতন ভাবিবার বিষয় পাইলেন। এপর্য্যন্ত তিনি নিজের বিবাহ সম্বন্ধে বেশী কিছুই ভাবেন নাই, তাহাকে আর কেহ কখনও দেখিতে আইসে নাই। সরোজিনীর বয়স যদিও হিন্দুসমাজানুসারে অনেক হইয়াছে তথাপি তাহার বিবাহের কথা তিনি এই প্রথম শুনিলেন। তাহার পিতা অনেকদিন ধরিয়া একটি সস্তামূল্যে সুপাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্তও তাঁহার আশা সফল হইল না। এ দিকে কন্যার বয়সও বেশী হইল, প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়। প্রতিবেশী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলে এই কথা রামগোপাল দত্তকে জানাইতে লাগিলেন। কি করেন দত্ত মহাশয় কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সকলেই কাণাঘুষি করিতে লাগিল "ওমা! মেয়ে এত বড় হল; বিয়ের নাম গন্ধও নাই, কবে জাত যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।" এ কথাও রামগোপালের কাণে গেল। এখন মহামুস্কিল, মনোমত ছেলেও পান্ না, বিবাহ না দিয়াও আর থাকিতে পারেন না। এ দিকে এক বৃদ্ধ ঘটক মহাশয় একটি সম্বন্ধ জুটাইয়া লইয়া আসিলেনঃ—"ছেলের বয়স কিছু বেশী, প্রায় ত্রিশ; তবে দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়।

দু. দশ টাকার সুসারও আছে, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হবে না। ছেলেটি যদিও ইংরাজি লেখা পড়া জানে না কিন্তু বাঙ্গলা বেশ জানে, ছেলে বেলায় ছাত্রবৃত্তি পাশ দিয়েছিল, এখন জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করে, বেশ দু টাকা উপায়ও কর্‌ছে। তাতে বড় কুলীন।" দত্ত মহাশয় কিঞ্চিৎ কুলীন ভক্ত। একে বড় কুলীন, তাতে আবার জাত যায়। সুতরাং এ কাজে মত দিলেন। ঘটক মহাশয় পরমাত্মীয়। তাঁহার কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া দত্ত মহাশয় ছেলে দেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। 'শুভস্যশীঘ্রং' বলিয়া ঘটক মহাশয় দত্তমহাশয়ের সম্মতি লইয়া বর পক্ষের দুই জনকে কন্যা দেখাইতে লইয়া আসিলেন। অদ্য এই দুইটি ভদ্রলোকই জলযোগ করিতে ছিলেন। জলযোগ শেষ হইলে পর দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। সেখানে অনেক কথা-বার্ত্তার পর বিবাহ এক প্রকার স্থির হইল। তাহাদের আহার ও শয়নের বিশেষ তদ্বির করা হইল। শুদ্ধ কন্যা দেখা বাকি। না হইলেও বিশেষ আপত্তি নাই কারণ তাহাদের সংসারে মেয়ে লোক কম; বৌ একেবারে যাইয়া সংসার করিতে পারিবে ইহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি?

এদিকে সরোজিনী নিজের শয়নগৃহে যাইয়া এই নূতন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'বিবাহ কি' 'ইহাতে সুখী হইবেন কি দুঃখী হইবেন' এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে ঘোরতর আন্দোলিত করিয়া তুলিল। যতই চিন্তা গভীর হইতেছে ততই ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইতে লাগিল, ততই এ চিন্তা ভার জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সরোজিনী স্বভাবতই চিন্তাশীলা, তাহাতে সুশিক্ষার ফলে চিন্তাশক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই নূতন বিষয় পাইয়া চিন্তাশক্তি বিশেষ উত্তেজিত

হইয়া উঠিল। রামায়ণ, মহাভারত সরোজিনী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। এখন এই অতুল ভাণ্ডার হইতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি জগন্মান্য সতীদিগের আখ্যায়িকা সাহায্যে এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিলেন।

অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে ভালবাসাই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ—এই ভালবাসার জন্যই তাঁহারা জগতের পুজনীয়া। "এই ভাল বাসার জন্যই সীতা রামের সহিত রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া দুঃখকষ্ট পূর্ণ বনে গমন করিয়াছিলেন, এই জন্যই রাক্ষসের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। আবার যখন রাম তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইলেন তখন রামের মঙ্গল কামনা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না কেন? সে কি কেবল ভালবাসার জন্যই নহে? এই ভালবাসার জন্যই কি তিনি রামকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী মনে করিয়া পর জন্মে তাঁহাকেই পতি কামনা করিয়াছিলেন না? দময়ন্তীর মধ্যেও এই ভালবাসা। সতীশিরশোভিনী সাবিত্রীতে এই ভালবাসার উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। অবশ্যম্ভাবী অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা জানিয়াও তিনি সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন কেন? সে কি কেবল ভালবাসার জন্যই নহে? আর এই অজেয় ভালবাসার বলেই কি তিনি মৃত্যুকেও জয় করিলেন না?

সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভেদ কি? সকলেরই ত বিবাহ হয় কিন্তু ইঁহারাই তবে কেবল সতী কেন? এ প্রভেদ কিসের জন্য? ইঁহারা যেমন ভালবাসিতেন আর কেহ সেরূপ ভালবাসে না এই কি ইহার প্রকৃত কারণ নয়? যদি তাহাই হয় তবে ভালবাসাই সতীত্বের মূল। অতএব যদি সতী হইতে হয় তবে বিবাহে ভালবাসা থাকা

একান্ত আবশ্যক। ভালবাসা না থাকিলে সে বিবাহ বিবাহই নহে—আচ্ছা তবে আমার এই যে বিবাহের কথা হইতেছে, এ কি রূপ? যাহার সহিত বিবাহ হইবে আমিত তাহার কিছুই জানি না। যাহাকে কখনও দেখি নাই, যাহাকে জানি না, তাহাকে ভালবাসিব কিরূপে? যদি ভালবাসিতে না পারিলাম তবে বিবাহ হইবে কি প্রকারে! * * * * * আচ্ছা আমি কি কাহাকেও ভালবাসি? অনেককেই ত ভালবাসি। তবে সকলের চেয়ে ভালবাসি মাকে, বাবাকে, সুরবালাকে আর সতীশ—"

'দাদা' কথাটি আর উচ্চারিত হইল না। সরোজিনীর আর পুর্ব্বে কখনও এমন ঘটে নাই। সতীশকে তিনি এখন নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। সতীশের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন এক অপূর্ব্ব ভাবে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার শরীর ঈষৎ রোমাঞ্চিত হইল, শরীর ঈষৎ কাঁপিল। এইরূপে তিনি প্রণয়ের রাজ্যে প্রথম প্রবেশ লাভ করিলেন।

সরোজিনী ভাবিতে লাগিলেন বাল্যকালাবধি তিনি সতীশকে কেমন ভালবাসেন, সতীশও তাহাকে কেমন স্নেহ করেন তিনি যাহা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন সে সমস্তই সতীশের নিকট। তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে কি সুখের হয়! তাহা হইলে তিনি কত কি শিখিতে পারিবেন, আর—আর যাহার কথা শুনিতে তিনি বাল্যকাল হইতে ভালবাসেন তাহার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাইবেন। এই কথা ভাবিতে তাহার মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল!

সরোজিনী এইরূপ নানা চিন্তায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অত্যন্ত বেশী চিন্তার পর নিদ্রা হওয়াতে নিদ্রা গভীর হইতে

পারিল না। সকালবেলা স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সরোজিনীর মাতা তাহার অনিদ্রা ও চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ, গম্ভীর মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সরো, মা তোর কি হয়েছে?" সরোজিনী "কৈ, কিছুই না" বলিয়া অন্য মনে স্বীয় কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

কিছু কাল পরে কন্যা দেখাইবার উদ্যোগ হইল। সরোজিনী যন্ত্রবৎ যথাস্থানে আনীত হইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য মুখাবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল। বর পক্ষীয়েরা কন্যা দেখিয়া "আহা! বেশ মেয়েটি" বলিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়া নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। সরোজিনীও তাহার নিজের চিন্তাভার লইয়া একবার সুরবালাদের বাটীতে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সতীশ পটলডাঙ্গায় এক বাসায় থাকেন। অদ্য বেলা তিনটার সময় একটি ছোট নির্জ্জন ঘরে নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন অথচ নির্দ্দিষ্ট চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। কিছুই পড়িতে ভাল লাগিতেছে না। একবার এখানা, একবার ওখানা করিয়া পুস্তক লইয়া দুই চারি ছত্র পড়িতেছেন; আবার তাহা পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিতেছেন। কিছুতেই মনের চাঞ্চল্য নিবারণ হইতেছে না। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে আর কলিকাতায় থাকা ভার। তাহাতে আবার ছুটী নিকট বলিয়া এ কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশেষে রবীন্দ্র বাবুর সন্ধ্যা সঙ্গীত খানা খুলিলেন। খুলিবামাত্র

ফুটিতে পারিত ফুল, না ফুটিয়া ঝ'রে গেল,
গাহিতে পারিত পাখী না গাহিয়া ম'রে গেল।

এই দুইটি ছত্র তাঁহার নয়নগোচর হইল। ছত্র দুইটি তাঁহার মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া দিল। ক্রমশঃ তাঁহার মন গভীর চিন্তায় অভিভূত হইল। ভাবিতে লাগিলেন "সংসারে কেন এরূপ অকাল বিনাশ রহিয়াছে? পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করিলে এরূপ না করিয়া সংসারকে পূর্ণ করিতে পারিতেন না? পারিতেন বৈকি! কিন্তু এ যে অমঙ্গল জনক তাহারই বা প্রমাণ কি? অনেক সময়ত দেখিয়াছি অমঙ্গল হইতে মঙ্গল প্রসূত হইয়া থাকে। হয় ত ইহা আমাদের উন্নতির সোপান। আমরা ইচ্ছা ও যত্ন করিলে হয়ত এ অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারি।" এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে দেশের কথা, সমাজের দুর্গতির কথা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলেন "আমাদের সমাজে অর্দ্ধেকের অধিক স্ত্রীলোক। এই অর্দ্ধাংশ মূর্খ, পরাধীন ও পরতন্ত্র। যে সমাজে অর্দ্ধেকের অধিক লোকের অবস্থা এরূপ শোচনীয়, সে সমাজের উন্নতির আশা কোথায়! কিন্তু তাহাদের অবস্থা এরূপ হইল কেন? তাহারা কি স্বভাবতঃই এরূপ নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট? এ কথা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। রাণী ভবানী, রাণী শরৎ সুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও ত বাঙ্গালী। তাঁহাদের ন্যায় ধার্ম্মিকা ও ধীশক্তি সম্পন্না স্ত্রীলোক কয়জন কোন্ সমাজে মিলে? তবে আমাদের দেশে সারা মার্টিন, মেরী কার্পেণ্টার জন্মায় না কেন? অবশ্য কারণ আছে—কারণ শিক্ষার অভাব। রৌদ্র বৃষ্টি না পাইলে বৃক্ষ বাড়িবে কিরূপে, ফুল ফুটিবে কিরূপে? আর অজ্ঞানাচ্ছন্না, কুসংস্কার-পীড়িতা, অন্তঃপুর নিবদ্ধা বঙ্গরমণী স্বাধীন প্রাণা সারামার্টিন হইবে কেমন করিয়া? বঙ্গ রমণী পুরুষের সেবিকা; তিনি ধর্ম্ম

কি—বুঝেন না; ভালবাসা কি—বুঝেন না; সমাজ কি—বুঝেন না মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি—বুঝেন না; তাহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে উচ্চ আশা, উচ্চ ভাব প্রবেশ করিতে পারে না।" স্ত্রীলোকদিগের এই দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে সতীশের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সতীশ! তোমার কোমল হৃদয়ে আজ আঘাত লাগিয়াছে। অভাগিনী বঙ্গরমণীর দুঃখ স্মরণ করিয়া তোমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে! হায় পাপী মনুষ্য তোমার ও অশ্রুজলের আদর কিরূপে বুঝিবে? যাহারা নিজের সুখ ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝে না, যাহারা নিজের ক্ষুদ্রতা লইয়াই সুখী তাহারা তোমার ও মহৎ হৃদয়ের উচ্চতা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে? যাহারা নিজেরাই উৎপীড়ক তাহারা উৎপীড়িতের দুঃখ দেখিবে কেন? যদি কোন দেবতা আজ উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে তোমার ও অশ্রুজলের মূল্য হইত, তাহা হইলে আজ উহা পদ্মযোনীর কমণ্ডলুতে সাদরে, অমূল্য রত্নজ্ঞানে রক্ষিত হইত! হায়! কবে মনুষ্য তোমার ও অশ্রুজলের আদর করিতে শিক্ষা করিবে!

সতীশ, একেবারে অধীর হইও না। এ সমস্ত অত্যাচারত অতি সামান্য! (পাঠক! ক্ষমা করিবেন। এ সমস্ত ঘোরতর অত্যাচারকে সামান্য বলিলাম বলিয়া আমার এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা দূরে নিক্ষেপ করিবেন না। যদিও এ সমস্ত অত্যাচার অতীব ভয়ানক কিন্তু একবার বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিতে পাইবেন এ গুলি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় কি না?) যখন সমাজে প্রবেশ করিয়া এতদপেক্ষা সহস্রগুণে নৃশংস অত্যাচার, ঘোর পাপাচার দেখিবে, তখন না জানি তুমি কি করিবে!

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সতীশও শয্যা ত্যাগ করিয়া

গোলদীঘীতে বেড়াইতে গেলেন। কিয়ৎকাল একাকী বেড়াইতেছেন এমন সময়ে একটি যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত মিশিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সতীশের গম্ভীরমুখ প্রফুল্ল হইল। দুই জনে একটি নির্জ্জনস্থানে যাইয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সতীশ তাঁহার অদ্যকার আলোচিত কথা উত্থাপন করিলেন। উভয়েই আগ্রহাতিশয় সহকারে এ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে বিশেষ ব্যগ্রতা ও সরলতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। কিসে এ দুর্দ্দশার শেষ হইতে পারে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমাজের এই ঘোরতর অত্যাচারে উভয়েই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। উভয়েই এই মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময় তোপ পড়িল। রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া উভয়েই গৃহে চলিয়াগেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই নূতন যুবকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইঁহার নাম শরৎচন্দ্র ঘোষ। ইনি সতীশের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন। সতীশ কিছু একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন। কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ করিতেন না। এমন কি সহপাঠীদিগের মধ্যে অতি অল্প বালকের সহিতই তাহার আলাপ হইত। শরতের সহিত প্রথম পরিচয় কিঞ্চিৎ নূতন ধরণের। এক বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল ফাল্গুন মাসে সতীশ এক দিন বিকালে গোলদীঘীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্-

কালে উত্তর পশ্চিম কোণে একটু কাল মেঘ দেখা দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীতা পৃথিবীর উপর স্থির কঠোর কটাক্ষপাত করিতেছে, ভয়ে প্রকৃতি জড়সড়, নিশ্চল—এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ। শকুনি, চিল প্রভৃতি পক্ষীকুল ভয়াকুল হইয়া স্বীয় স্বীয় আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে কিন্তু নিতান্ত ভয়বিহ্বল হওয়াতে দিশাহারা হইয়া অনন্ত আকাশে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া অধিকাংশ বালক তাড়াতাড়ি করিয়া গৃহে গমন করিল কিন্তু সতীশ কিছু প্রকৃতিপ্রিয়। প্রকৃতির এই গম্ভীর ভয়ানক সৌন্দর্য্য তাহার নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তিনি মুগ্ধ হইয়া সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘ রাশির ভীমকান্তি দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ একটা ঝড় উঠিয়া রাস্তার ধূলি উড়াইয়া সমস্ত অন্ধকার করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিল। সতীশ কি করেন, সংস্কৃত কলেজের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে আর একটি যুবক আসিয়া সেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে মূষল ধারে জল পড়িতে লাগিল। বৃষ্টি আর থামে না। কি করেন উভয়েই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বসিয়া রহিলেন। উভয়েরই আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম দর্শন হইতেই উভয়েরই অন্তরে কেমন একটি নুতন মনোরম ভাব আসিয়াছে কিন্তু কি করেন, অপরিচিত; আলাপ করিতে লজ্জা হইতেছে। উভয়েরই মনে হইতেছে 'যদি উনি প্রথমে আলাপ করেন।' কিন্তু কেহই আর লজ্জার মাথা খাইয়া প্রথম কথা কহিতে পারিতেছেন না। এই রূপে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। অনেক ক্ষণ পরে 'আ! ভারি ছিট্ আস্‌ছে, আর বস্‌তে দিলে না' বলিয়া শরৎ একটু সতীশের দিকে সরিয়া বসিলেন। এখন

উভয়েই অত্যন্ত নিকট হইয়াছেন। সতীশ আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়! ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন। বড় ইচ্ছা হচ্চে আপনার নিকট পরিচিত হই। আমার নাম সতীশচন্দ্র রায়, নিবাস মনোহরপুর, জেলা——মহাশয়ের নাম জান্‌বার জন্য আমার মন বিশেষ উৎসুক হয়েছে।'

শরৎ। আজ্ঞে, আমারও আপনার সহিত আলাপ করবার বড় ইচ্ছা হচ্চিল। আমার নাম শরৎচন্দ্র ঘোষ নিবাস এখানেই।

উভয়ের এইরূপে প্রথম পরিচয় হইল। ক্রমশঃ উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। বৃষ্টিও থামে না, তাঁহাদের কথারও শেষ হয় না। শরৎ বলিলেন, 'মহাশয়, প্রকৃতির নিত্য নূতন মুখশ্রীর মধ্যে তারতম্য বিচার করা সুকঠিন। পূর্ণিমার রাত্রে যখন প্রকৃতির মুখে গাল ভরা হাসি দেখি তখনও মন আনন্দে উছলিয়া পড়ে, আবার যখন আকাশ মেঘে একেবারে ছাইয়া ফেলে, মূষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে ও বজ্রের কড় কড় শব্দে শ্রবণ বধির হয় তখনকার সে ভাব দেখিলে এক মহাশক্তির ভাবে মন অভিভূত হয়, বস্তুতঃ ইহার মধ্যে কোন্‌টি যে অধিকতর সুখপ্রদ তাহা ঠিক্ করা এক প্রকার অসম্ভব।

সতীশ। তা'ত বটেই। ভগবানের রাজ্যে ত সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ঢালা রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে, তবে আমাদের চোক্ নাই বলিয়াই আমরা তাহা দেখিতে পাইনা। সে দোষ ত আর ভগবানের নয়। (উভয়ে একটু হাসিলেন) মহাশয় বৃষ্টির সহিত যেন আমার বাল্যকালটি জড়ান রহিয়াছে। বৃষ্টি দেখিলেই আমার বাল্যকালের কথাটি মনে পড়ে। যখন আমি খুব ছেলে মানুষ ছিলেম্ তখন বৃষ্টি হলেই আমি এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকৃতেম, আর ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়্‌ত

তাই দেখ্‌তেম্‌। প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু কর্‌তে থাকৃত, কেমন যেন একটা অচেনা জায়গায় যেয়ে পড়তেম, কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌তেম না। কাক গুলো যেমন ঠোঁট উচু করে চুপ করে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে থাকে যেন কতই কি ভাব্‌ছে, আমিও ঠিক অমনি করে বসে থাক্‌তেম্‌।

শরৎ। ছেলে বেলায় আমারও কতকটা অমনি হত বটে তবে বেশীর ভাগ বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে কিছু ভাল বাস্‌তেম্‌। বৃষ্টির সময় আমাকে ধরে রাখা বড় দায় হ'ত। ছুট পেলেই ভিজ্‌তেম। তার জন্য কত বার বকুনি আর মা'রই খেয়েছি! আমি ছেলে বেলায় কিছু দুরন্ত ছিলেম। মা'র ও বকুনিতে আমার বড় লজ্জা হতো না। (অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল) এখনও বড় একটা হয় না!" একটু নিরব থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, 'প্রকৃতির প্রতি আসক্তি মনুষ্য মাত্রের স্বাভাবিক সম্পত্তি। বাল্যকালে সকলেই কবি, সকলেই প্রকৃতির উপাসক। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রভেদ হয় এবং শিক্ষার প্রভেদে মনুষ্য মনের গতিও নানাপথাবলম্বন করে। যাহারা প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হয় তাহাদের হৃদয় দিন্‌ দিন্‌ শুকাইয়া যায় ও তাহারা সংসারে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়; আর যাঁহাদের এই আসক্তি শিক্ষা সহকারে উৎকর্ষ লাভ করে তাঁহারা সংসারের অলঙ্কার হইয়া পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করেন। বাস্তবিক এই প্রকৃতির প্রতি আসক্তিই ভগবৎপ্রেম ও মনুষ্যপ্রেমের মূল প্রস্রবণ।' এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। বৃষ্টি ধরিলে উভয়েই গৃহে গমনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। কিয়দ্দূর এক সঙ্গে চলিলেন, যখন উভয়কে ভিন্ন পথাবলম্বন করিতে হইবে তখন পরস্পর হস্ত গ্রহণ করিলেন, ঈষৎকম্পন করিলেন, প্রাণের বিমল সুখ ব্যঞ্জক একটু মৃদু হাসি হাসিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে

একটু ঘাড় নাড়িলেন। পরে উভয়েই স্ব স্ব গৃহাভিমুখী হইলেন।

এই এক দিনের আলাপে তাঁহাদের মন এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে যে যখন তাঁহারা গৃহে যাইতেছেন তখন পরস্পর মনে মনে পরস্পরের কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পর দিন বিকালে আবার যখন গোলদীঘীতে দেখা হইল তখন উভয়েই অত্যন্ত প্রফুল্ল মুখে আসিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। এইরূপে যে আলাপ আরম্ভ হইল তাহা ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। এখন কেহ কাহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারেন না। উভয়ে একত্রে অনেক সময় কাটাইতেন। হয় সতীশ শরতের বাটীতে যাইতেন, না হয় শরৎ সতীশের বাসায় আসিতেন। শরতের মাতা ও অপরাপর স্ত্রীলোকেরা ক্রমশঃ সতীশকে বাড়ীর ছেলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

শরৎ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। বাল্য বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা থাকাতে এবং ধর্ম্মে আসক্তি থাকাতে তিনি হিন্দু সমাজের প্রথানুসারে বিবাহ করিতে বরাবর অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও ভাবিতেন যে ছেলের বয়স প্রায় আঠার, উনিশ হল, আর বিবাহ না দিয়া রাখা ভাল দেখায় না! লোকেই কি মনে কর্‌বে, ছেলেই বা কি ভাব্‌বে!! মূল কথা এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দেওয়া ভাল নয়!!! পিতা মাতাই বা কি করেন, পুত্র উপযুক্ত, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বা বিবাহ দেন কি প্রকারে? এ জন্য শরৎ যে কতক পরিমাণে পিতা মাতার বিরাগভাজন না হইয়াছিলেন তাহাও নহে। তাঁহারা কখন কখন শরতের আশা ছাড়িয়া দিতেন—ভাবিতেন "ওটা বিগড়া-

ইয়া গিয়াছে, ও আর হিন্দুসমাজে থাকিবে না।” আবার কখনও ভাবিতেন “গরম রক্ত, এখন যা’করুক তা’করুক, রক্ত ঠাণ্ডা হ’লেই আবার সব ঠিক হবে।” তাঁহারা যাহাই মনে করিতেন, শরৎ অটল। হিন্দুসমাজের দুরবস্থা ও অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার মন দুঃখে ক্রোধে অভিভূত হইত। কখনও মনে করিতেন হিন্দুসমাজের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। তখন তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। আবার কখন কখন নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের লক্ষ্য কিছুতেই বিচলিত হইত না। দেশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। স্বার্থ সাধনের আশায় মত বিরুদ্ধ কার্য্য করা তাঁহার নিকট ঘোরতর পাপ বলিয়া প্রতীয়মান্ হইত। যাহারা শরতের অন্তর জানিত, তাহারা তাঁহাকে “অগ্নিশর্ম্মা” বলিত; বাস্তবিক ‘অগ্নিশর্ম্মা’ই শরতের প্রকৃত রাশি নাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী এখন অধিকাংশ সময়ই চিন্তামগ্না। সমাজ জোর করিয়া তাহাকে সময় না হইতে বিবাহ বিষয়ে ভাবাইতেছে তিনিও তাহাই ভাবিতেছেন, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। জোর করিয়া ফুল ফুটাইতে গেলে ফুল আপনিই মুদিত হইয়া আইসে, ফুটান যায় না। সরোজিনীরও তাহাই হইতেছে। বিবাহ বিষয়ে যতই ভাবিতেছেন কিছুতেই ইহার পরিষ্কার মীমাংসা হইতেছে না। মনে যেন ঠিক ধারণা

হইতেছেনা—কি যেন বাকি রহিয়া গেল। কিন্তু যাহাই হউক সতীশের বিষয়ে ভাবিয়া তাহার ভালবাসা দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন সতীশ তাহার একমাত্র ভাবনার বিষয়। সরোজিনী ক্রমে বরপাত্রটির গুণগ্রাম শুনিলেন। শুনিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা আরও বাড়িল। সতীশেতে আর তাহাতে স্বর্গ আর নরক। যখনই তাহাদের কথা ভাবেন তখনই সতীশের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে ও অপরের প্রতি ঘৃণা বাড়ে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর স্থির করিলেন যে তিনি কখনই এ বিবাহে সম্মত হইবেন না। কিন্তু হায়! হিন্দু বালিকার আবার সম্মতি কি? যে পরের ভোগসুখের সামগ্রী, তাহার আবার ইচ্ছা কি? ইহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

ক্রমে বাড়িতে বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ লোক সমাগম হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া তুলিল। পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের ভারি আমোদ, তাহারা বড় একটা কাজ পাইয়াছে—এই হুজুকে তাহারা দিন কয়েক কাটাইতে পারিবে। অনেক দিনের রুদ্ধ নিশ্বাস এই উপলক্ষে ত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। ইহা কি অল্প আমোদের কথা! হিন্দু রমণীর সময়ের মূল্যও এতদপেক্ষা অধিক নহে।

কেহ আর সরোজিনীর মত জিজ্ঞাসা করে না। বিবাহের দিন স্থির হইল, গায় হলুদের দিন স্থির হইল, তবু কেহ সরোজিনীর মত লইল না। সরোজিনী এখন কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভাবিলেন, ‘একবার সুরবালার মার নিকট যাই।’ যখনই যাহা কিছু বুঝিতে পারিতেন না তখনই সুরবালার মাতার নিকট যাইতেন, তিনিও সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন। এবারও সরোজিনী তাহাই করিলেন।

পবিত্রের নিকট সকলই পবিত্র। সরোজিনী সুরবালার

মাতার নিকট মনের কোনও ভাব কখনও গোপন করিতেন না। এ শিক্ষাও তাঁহার নিকট, সুতরাং সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট ভাঙ্গিয়া বলিলেন, কেবল সতীশের কথা গোপন রহিল, কারণ এখন সে কথার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও স্থির করিলেন যে আবশ্যক হইলে তাহাও প্রকাশ করিবেন। সতীশের মাতা অনেক ভাবিয়া বলিলেন 'যদি তোমার এ বিবাহে ইচ্ছা না থাকে তবে এ বিবাহ হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিবাহ মনে—অনুষ্ঠানে নহে। যদি মন বিবাহ করিতে না চায়, তবে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। বিবাহ দিলেও সে বিবাহ নহে। পরমেশ্বরের নিকট তাহা কখনই বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। যদি এ বিবাহে তোমার একান্তই অমত থাকে তবে সাবিত্রীর কথা মনে করিয়া তোমার হৃদয়কে দৃঢ় কর ও তোমার বাপ মায়ের নিকট নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ কর। আমিও এবিষয়ে তোমার মাকে বলিব।' তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিলেন তাহা এইরূপে বলিয়া সরোজিনীর মাতার নিকট যাইবার উদ্যোগ করিতে গেলেন। সরোজিনীও চিন্তাকুল মনে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপে গৃহাভিমুখিনী হইলেন। যাইতে যাইতে সাবিত্রীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আত্ম বিস্মৃত হইলেন। সাবিত্রী সম্মুখে দণ্ডায়মানা, রাজা ও দেবর্ষি নারদ আসীন, সাবিত্রী বলিতেছেনঃ——

"পিতঃ! ক্ষমা করিবেন। আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমি অন্তরে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। তিনিই আমার স্বামী, অন্য কেহ আমার স্বামী হইতে পারিবেন না। আমাকে দ্বিচারিণী করিবেন না।"

সরোজিনীর শরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রাণের মূল পর্য্যন্ত নড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কল্পনার রাজ্য অন্ধকার হইয়া আসিল। সাবিত্রী অদৃশ্যা, নিজের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ পথে উদিত হইল। তখনই কে যেন সরোজিনীর কর্ণমূলে বলিয়া দিল 'এ বিবাহ হইলে তুমি দ্বিচারিণী হইবে।' একথা হৃদয়ে উঠিবামাত্র তাহার শরীর কণ্টকিত হইল; বলিয়া উঠিলেন "কি? আমি দ্বিচারিণী হইব? কখনই নহে। লেখা পড়া শিক্ষার ফল কি এই হইবে? কখনই নহে।" শরীর মন উত্তেজিত হইয়াছে। সরোজিনীর ধমনীতে রক্ত খরতরপ্রবাহে প্রবাহিত হইল। তিনি দ্রুতপদে গৃহে চলিলেন। বাড়ী যাইয়া একেবারে মাতার গৃহে উপস্থিত। মাতাকে একাকিনী দেখিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। মাতা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, মুখচুম্বন করিয়া গদগদস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা তোর কি হয়েছে?' সরোজিনীর আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। দরদর ধারে দুই কপোল বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। মাতা কন্যার কষ্টের কারণ না জানিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পুনরায় মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা, তোর কি হয়েছে?' সরোজিনী অতি কষ্টে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন 'মা, আমার বিয়ে দিও না।' তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তথাপি বলিলেন 'ছি! মা, অমন কথা বল্‌তে নাই।' সরোজিনী তখন আর কোন উত্তর করিলেন না, উত্তর করিবার শক্তিও ছিল না। কিছুকাল পরে বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণী উঠিয়া গেলেন, সরোজিনী বসিয়াই রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৃহিণী কন্যার দুঃখে বিশেষ মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন। তাহাতে ভাবী জামাতার বিশেষ কোন গুণ না থাকাতে প্রীত হইতে পারেন নাই। যখনই কন্যার সহিত জামাতার তুলনা করেন তখনই আর এ বিবাহে ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু এদিকে বিবাহের প্রায় সমস্ত প্রস্তুত। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় সতীশের মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণী অতি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর গৃহিণী বলিলেন ;—"দিদি, আমার দুরদৃষ্টের কথা কি আর বল্‌ব। এদিকে মেয়ের বিয়ের সকলই প্রস্তুত। আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই টেরপেয়েছে। কিন্তু মেয়ের এ বিয়েতে সম্পূর্ণ অমত। সে আজ আমার কাছে কেঁদে বল্লে "আমার বিয়ে দিওনা।" ছেলেটি লেখা পড়া বেশী জানে না, তাতে আবার বয়স বেশী। মেয়ের ত অমত হতেই পারে। আমি যে এখন কি করি কিছুই মাথা মুণ্ড বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এখন আমার মরণ হলে হাড়ে বাতাস লাগে।" এই বলিয়া গৃহিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সতীশের মাতা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বোন্, সরোজিনীরই বা দোষ কি? সে লেখা পড়া শিখেছে, বিলক্ষণ বুঝ্‌তে সুজ্‌তে পারে। তার এ বিয়েতে ত অমত হতেই পারে। আর আমাদের ছেলে বেলার কথা ভেবে দেখ্‌লেই সব বুঝতে পারা যায়। তবুও আমরা তখন লেখা পড়া বেশী কিছুই শিখি নাই। সরোজিনী আজ আমার কাছে গিয়াছিল, বল্লে, যে ভাল-

বাসাই বিবাহের জীবন। ভালবাসা না থাক্‌লে সে বিবাহ বিবাহই নহে। যাহাকে কখনও দেখে নাই, যাহার সহিত শিক্ষা ও বয়সে এত প্রভেদ তাহার সহিত ভালবাসা হ'বারই বা সম্ভাবনা কি? বাস্তবিক এ কথা গুলি বড় সত্য। এমন অবস্থায় আমার বিবেচনায় এ বিবাহ হওয়া কখনই উচিত নহে। তুমি কর্ত্তাকে একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, তিনি অবশ্যই বুঝিবেন।"

গৃহিণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমারও তাঁহাকে বল্‌বার ইচ্ছা আছে কিন্তু বল্লে যে বেশী কিছু ফল হবে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না। কারণ এই এতকাল ধরে ছেলে খুঁজলেন কিন্তু ভাল ছেলে মিলিলনা। এ সম্বন্ধ ছেড়ে দিলেই বা মনোমত ছেলে পাওয়া যায় কোথায়? মেয়েরও বয়স বেশী হয়েছে, লোকে নিন্দা কর্‌ছে, বিয়ে না দিয়েও আর রাখা যায় না। আমারই মহা মুস্কিল। যাহা হউক একবার আমি তাঁর হাত পা ধ'রে বল্‌ব।"

স—মাতা। আমিও ছেলের কথা ভাব্‌ছিলেম। আজ কাল যেমন সময় পড়েছে তাতে ভাল ছেলে মিলা বড় সোজা কথা নয়। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। তা'হলে বোধ হয় এক রকম সুবিধা হ'তে পারে।

গৃহিণী। কি? বল না।

স—মাতা। আমি ভাব্‌ছিলেম, সতীশের যে রকম মত তা'তে সে ত কুল মান্‌বে না, জাতই মানে কি না সন্দেহ। আমিও যে কৌলীন্য প্রথাকে বড় ভাল মনে করি তাহাও নহে। তা'হলে সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ হ'লে হয় না?

গৃহিণী। বটেত, সে ত খুব ভাল কথাই। সতীশের মত ছেলে খুঁজে পাওয়া ভার। এতে বোধ হয় কর্ত্তারও সম্মতি

হ'তে পারে, যাই তিনি বোধ হয় ওঘরে আছেন। তুমি ভাই একটু বস।

স-মাতা। না ভাই, আমি আর বস্‌ব না, বাড়ী ফেলে এসেছি। এই বলিয়া সতীশের মাতা নিজ গৃহে গেলেন। গৃহিণীও কর্ত্তার নিকট চলিলেন।

যাইয়া দেখেন যে কর্ত্তা পোষাক পরিয়া বাহির হইতেছেন। বলিলেন 'আমার একটা কথা আছে, একটু স্থির হ'য়ে বসে শুন্‌তে হবে।'

কর্ত্তা। কাজের সময় তোমার যত কথা। কি বল্‌বে শীঘ্র বল। আমার ভারি দরকার।

গৃহিণী। আমারও দরকারী কথা। আচ্ছা, তুমি যে জামাইটি এনেছ, সেটিত মেয়ের সহিত মানায় না। মেয়ে তা'র চেয়ে অনেক বেশী লেখা পড়া জানে।

কর্ত্তা। আমাকে আর ও কথা বলে জ্বালিও না। আমি কি এখন একটি ছেলে গড়্‌ব।

গৃহিণী। তা'বল্লে কি হয়। মেয়ের এবিয়েতে সম্পূর্ণ অমত। সে আজ আমার কাছে কেঁদে বল্লে, "আমার বিয়ে দিও না।"

কর্ত্তা। নাও, নাও। ও সব কথা আমার কাছে বলনা। মেয়ের আবার অমত? আমার মতের উপর আবার মেয়ের মত। ও সব জাত যাওয়া কথা আর মুখে এন না। তোমাদের মেয়ে লোকের একটা কথাই আলাহিদা।

গৃহিণী। তা'র অমতে বিয়ে দিলে সে যদি বেজায় একটা কিছু করে বসে, তখন?

কর্ত্তা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন 'সেটা যত সহজ মনে করছ তত সহজ নয়। যাহা হউক এখন তুমি কি কর্‌তে বল?'

গৃহিণী। সতীশের মা একটা কথা বল্লে। সতীশ ত কুল-

টুল মানে না। সেত কুল ভাঙ্গতে রাজি হবে। মারও এ বিষয়ে অমত নাই। সতীশের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?

কর্ত্তা। সেই খৃষ্টান্‌টার সঙ্গে? সেটাত দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না, অখাদ্য খায়, ব্রহ্ম সমাজে যায়! তা'তে আবার পৈতৃক কুল ভাঙ্গবে। তবেইত সে একটা জাতনাশা। তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিলে কি আমার আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে? লোকে আমার মুখ ভরে—কর্‌বে। আর সে ত একটা পাষণ্ড, সেই না হয় কুল ভাঙ্গলে। আমি বুঝে সুজে কি করে এক জনার কুল ভাঙ্গি। তা'হলে কি কুল লক্ষ্মীর শাঁপে আমার কিছু থাক্‌বে? আমি তা'হলে নির্ব্বংশ হব। ও সব কথা ছেড়ে দাও। এ কাজ আমি প্রাণ থাক্‌তে কর্‌তে পার্‌ব না।

গৃহিণী। মেয়ের সুখত একবার দেখা উচিত। সে যদি চির-দিন কষ্ট পায় তা'হলে তুমিই কি সুখী হতে পার্‌বে?

কর্ত্তা। তা'র দুঃখই বা এমন কি? খাওয়া পরার কোন কালে কষ্ট পাবে না, বেশ দশ টাকার সঙ্গতি আছে। তবে ছেলেটি লেখা পড়া বেশী কিছু জানে না। তা কপালে না থাকলে আমি কি কর্‌ব। আমিত আর চেষ্টায় কসুর করি নাই। তাদের লোক জনও দশটা বেশ আছে। তা'তে বড় কুলীন। তা'দের মত মানী লোক দেশের মধ্যে কজন আছে? অমন কুলীনকে মেয়ে দিতে পার্‌লে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে। মেয়ের দ্বারা আর উপকারই বা কি? মেয়ে ত আর দশ টাকা উপায় করে খাওয়াবে না। তবে তা'কে যে এত কাল খাওয়ালেম পরালেম তা'র ফল এই যে তা'কে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পার্‌লে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে, আমার কত মান বাড়্‌বে, একঘর কুটুম্ব বেশী হবে। যদি তাই না হল তবে এমন মেয়ে থাক্‌লেই কি

আর না থাক্‌লেই কি? এমন মেয়ে থাকার চেয়ে বরং মরে যাওয়াই ভাল।

এই কথা বলিয়াই কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী "খেতে পর্‌তে পেলেই সুখী হয়" এ কথাটি একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া আপনাদিগের দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

হা! সন্তান বৎসল হিন্দুগণ! এই কি তোমাদের অপত্য-স্নেহ? এই রূপেই কি তোমরা কন্যার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া থাক? এই কি তোমাদের প্রাণাধিকা কন্যা?

হা! মাতৃ ভক্ত হিন্দুগণ! তোমরা একবারও কি মনে কর না যে তোমাদের মাতারা স্ত্রীলোক, তাঁহারাও এক সময়ে কন্যা ছিলেন! তাঁহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে কি এক বারও তোমাদের মাতৃ ভক্তিতে আঘাত লাগে না? হায়! তোমরা এই রূপেই বংশের মুখ উজ্জ্বল কর বটে!

হা অবজ্ঞাতা হিন্দু রমণীগণ! তোমরা কতকাল আর এরূপ স্নেহময় পিতার আশ্রয়ে থাকিবে জানি না! তোমাদের অবস্থা যখন এরূপ তখন কেন তোমরা চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবার জন্য পরের সুখ ভোগের উপকরণমাত্র হইয়া বঙ্গগৃহে জন্মগ্রহণ কর! তোমরা আর বাঙ্গালায় জন্মিও না, বাঙ্গালী জাতি পৃথিবী বক্ষঃ হইতে বিলুপ্ত হউক!

নবম পরিচ্ছেদ।

শনিবার বেলা পাঁচটার সময় একখানি ট্রেন আসিয়া—ষ্টেসনে থামিল। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে দুইটি যুবক একটি ছোট পোর্টমেণ্ট হাতে করিয়া নামিলেন। নামিবা মাত্র একটা মুটে "বাবু, মোট যাবে?" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা মুটের মাথায় পোর্টমেণ্টটি দিয়া একটি দোকানে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন ও মুটে সমভিব্যহারে নদীর ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এক খানা ছোট পান্‌সি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া মুটেকে সন্তুষ্ট করিলেন, এদিকে মাঝিরাও "আল্লা আল্লা" বলিয়া নৌকা ভাসাইল।

শরৎ কলিকাতার ছেলে, আর কখনও নৌকায় উঠেন নাই। নৌকায় উঠিয়া প্রথমতঃ একটু শঙ্কা হইতে লাগিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে শঙ্কা ভাসিয়া গেল, মন আনন্দে নৌকার সহিত তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। সতীশের পক্ষে নৌকা যাত্রা যদিও নূতন নহে তথাপি বহুকাল কলিকাতার প্রস্তরময়ী রাস্তার ধূলিতরঙ্গ-দর্শন-ক্লিষ্ট-চক্ষু, ধূলি বিমিশ্রিত বায়ু-সেবন-ক্লিষ্ট-নাসিকা অদ্য নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ক্রীড়া দর্শনে প্রীত হইল, তরঙ্গ সংস্পর্শে সুস্নিগ্ধ, নির্ম্মল বায়ু সেবনে পবিত্র হইল। স্বভাব সংস্পর্শে হৃদয় পবিত্রতা পূর্ণ হইয়া একেবারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তখন চারিদিকে সমস্ত বস্তুতেই পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য মাখান দেখিলেন। হৃদয় তখন আপনা হইতেই "সুন্দরং" "সুন্দরং" বলিয়া উঠিল। শরৎ স্তম্ভিতভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন ছিলেন। "সুন্দরং" "সুন্দরং' কথাটি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে মিশিয়া

গেল। শরতের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শরৎ বাল্যকাল হইতেই কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, এখন স্বভাবের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কোনও কথা কহিতে ভুলিয়া গেলেন। কোথায় ছিলেন, কোথায় যাইতেছেন সে জ্ঞান নাই।

সতীশের সুখের সীমা নাই। নির্ম্মল সলিলা তরঙ্গিনীর তরল হৃদয়ে সান্ধ্য সমীরণ সংযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তক তুলিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, সতীশের হৃদয়ের মধ্যেও আজ ঐ রূপ কত শত তরঙ্গ উঠিতেছে, খেলিতেছে, দুলিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে! সতীশের মন সেই তরঙ্গ গণিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। মাতা ও ভগিনীদ্বয় কিরূপে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে স্নেহের তরঙ্গ কিরূপে উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার প্রাণে আছাড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলের শিরোদেশে অধিরোহণ করিলেন। তাৎকালীক রশ্মিজালে নদীবক্ষ, বৃক্ষশির ও ধবল মেঘরাশি সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিল। মেঘজাল প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিধীরে ধীরে নূতন নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রশ্মিমালা নদীবক্ষ, বৃক্ষশির ত্যাগ করিল, ক্রমে আকাশ প্রান্তেও দেখা যায় না। ক্রমে মলীন বসনা সন্ধ্যা আসিলেন, কোমল হৃদয়া স্রোতস্বিনীর মুখও ম্লান হইল। কিঞ্চিৎ পরেই আবার চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে ঘোমটা খুলিলেন, তরলা তরঙ্গিনীও তাহার হাসি দেখিয়া হাসিয়া কুটি কুটি। হাস্যময়ী চন্দ্রমা তরঙ্গমালার খেলা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, সহস্রধা বিভক্ত হইয়া একেবারে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তরঙ্গেরা তাহাকে পাইয়া একেবারে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া লাফালাফি করিয়া খেলিতে লাগিল। এ খেলা দেখিয়া প্রকৃতি দেবীও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও হাসি মুখে একেবারে সহস্র চক্ষু মেলিয়া হাসির স্রোতে জগত ভাসাইয়া দিয়া স্থির ভাবে খেলা দেখিতে লাগিলেন। আর শরৎ ও সতীশ? তাঁহারা এই অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া হত বুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে তীর হইতে দুইটি কচি গলা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল 'মা, মা, দাদা এসেছে।' সতীশের চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন—যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও হত বুদ্ধি হইয়া গেলেন—এতক্ষণ ধরিয়া যে চাঁদের মেলা, চাঁদের খেলা দেখিতে ছিলেন সে কেবল ছায়া মাত্র প্রকৃত চাঁদের মেলা তীরে। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বাড়াইয়া রহিয়াছে।

পাঠক! সতীশের অবস্থা ভাবিয়া লউন। লেখনী হৃদয় দেখাইতে অক্ষম। নৌকা এখনও ঘাটে লাগে নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সতীশের নিকট যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। মাতার কোলে নরেশ, সুরবালা ও গিরিবালা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সতীশ শরতের হস্ত ধারণ করিয়া তীরে নামিলেন। প্রথমেই মাতৃপদধূলি শিরে ধারণ করিয়া নরেশের মুখ চুম্বন করিলেন। ইত্যবসরে গিরিবালা বাহু দ্বারা দাদার গলা বেষ্টন করিল। সতীশ গিরিবালাকে হৃদয়ে জড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং দক্ষিণ বাহু দ্বারা সুরবালার গলা বেষ্টন করিয়া হস্ত দ্বারা তাহার চিবুক ধরিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। মাতা শরৎকে দেখিয়া বলিলেন, 'কে? শরৎ? এস বাবা, এস। দুঃখিনীর বাড়ী চল।' এই বলিয়া তাঁহারাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ চলিলেন। বলা বাহুল্য যে শরতের পরিচয় ও তাঁহার আগমন সংবাদ পুর্ব্বেই সকলের জানাছিল। গৃহে যাইয়া দশ মিনিটের মধ্যেই গিরিবালা শরৎকে আপনার লোক করিয়া লইল। শরৎ সতীশের স্থান অধিকার করিলেন। গিরিবালা আজ আর শরতের পার্শ্ব ছাড়া হইল না। শরৎকে আম খাওয়াইতে হইলে গিরিবালা, পান দিতে হইলে গিরিবালা, বাতাস করিতে হইলে গিরিবালা। গিরিবালা একাই আজ আনন্দে মাৎ করিয়া তুলিল। সুরবালার পক্ষে শরৎকে আপনার লোক করিয়া লইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, কারণ শৈশবের অমায়িকতা এখন আর নাই, তাহার স্থানে এখন কৈশোরের ঈষৎ গম্ভীর ও সলজ্জ ভাব আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু আহারের পূর্ব্বেই তিনি 'দাদা' হইয়া বসিলেন। তাহারা এক দাদার স্থানে পাইলেন। আজ এই শান্তি নিকেতন আনন্দ নিকেতন হইল।

সতীশ সেই রাত্রেই সরোজিনীর বিবাহের কথা শুনিলেন, তাহার দুঃখের কারণও শুনিলেন। সমাজের অত্যাচারের কথা শুনিয়া বন্ধুদ্বয়ের হৃদয়ে তুষানল জ্বলিতে লাগিল। হিন্দু পিতার কন্যার প্রতি স্নেহ দেখিয়া তাঁহাদের ন্যায়ানুগত কোমল হৃদয় শোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। 'স্বার্থ অনুসারে সন্তানের প্রতি স্নেহ এই সামাজিক নৈতিক দুর্গতি সমাজ প্রতিষ্ঠিত ধার্ম্মিকচূড়ামণি দত্ত মহাশয়েতে পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সরোজিনীর উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি না চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ দত্তদিগের বাটীতে ভারি ধুম। চারিদিকে লোক ছুটাছুটী করিতেছে, আমোদ করিতেছে, কাজ করিতেছে। সকলেই ব্যস্ত। কেহ খাইতেছে, কেহ খাওয়াইতেছে; কেহ দিতেছে, কেহ নিতেছে, সকলেরই মুখে আহ্লাদের চিহ্ন। আজ সরোজিনীর বিবাহ। পাড়ার যুবতীরা বাসরঘরের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—কেহ গলা সাধিতেছে, কেহ শ্লোক মুখস্থ করিতেছে! এইরূপে সকলেই আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু ওই নির্জ্জন গৃহে করতল-বিন্যস্ত-কপোল ওই বিষাদপ্রতিমা খানি কে? এই সুখ সমুদ্রের মধ্যে এ ক্ষুদ্র বিষাদখণ্ড কেন? এ কি সমাজপীড়িতা সরোজিনী? তাইত বটে! এ যে শোক তাপদগ্ধা বৃদ্ধা বলিয়া বোধ হইতেছে? মুখের সে প্রফুল্ল প্রশান্ত ভাব কোথায়? সে হাসি হাসি মুখে যে এখন কালিমা পড়িয়াছে, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ মুখ যে কখন হাসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে না! মুখভাব প্রশান্ত কিন্তু এ যে প্রলয়ের ঝটিকার পূর্ব্বাহ্নের ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব, দেখিলেই মনে ভীতি সঞ্চার হয়। অভ্যন্তরে যেন তুমুল ঝড় বহিতেছে, বাহিরে তাহার করাল মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছে মাত্র।

সরোজিনীর আরও কষ্ট হইতেছে যে তাহার এ ব্যথার কেহ ব্যথী নাই—তিনি এই হাসির রাজ্যের মধ্যে এক খণ্ড বিষাদ মাত্র। সকলেই তাহাকে লইয়া আমোদ করিতেছে কিন্তু তাহার প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে যান; কিন্তু হায়! তাহার সে স্বাধীনতাও নাই। পাঠক! আপনি কি কখনও এ

'হাসির যন্ত্রণা' সহ্য করিয়াছেন? কখনও কি আপনার অসহ্য হৃদয় বিদারক দুঃখের সময় বন্ধু বান্ধবকে হাসিতে দেখিয়াছেন? তাহা হইলেই আপনি সরোজিনীর কষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন, নচেৎ অন্ধের নয়ন-প্রতিকর ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য্য দর্শনের ন্যায় আপনার সমস্ত আয়াস বিফল হইবে।

সরোজিনী এখন বুঝিয়াছেন যে তাহার আর কিছু মাত্র উপায় নাই। তিনি এই অনন্ত বিশ্বে এখন নিঃসহায়া। যে পিতাকে তিনি চিরদিন হিমাদ্রি সদৃশ অটল আশ্রয় মনে করিতেন—করিতেন কেন? আজও করেন; এই মুহূর্ত্তেই যিনি তাহার এক মাত্র আশ্রয় স্থান, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এখনও জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আজ সে আশ্রয় সরিয়া গিয়াছে। যে পিতাকে তিনি চিরকাল আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিয়াছেন, আজ দেখিলেন যে সেই পিতাই তাহার হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতে খড়্গোত্তলন করিয়াছেন, তথাপি মরণেও পিতাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। আজ দেখিলেন যাঁহাকে আজন্ম রক্ষক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনিই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তথাপি বঙ্গ বালার পিতা ভিন্ন গতি নাই। আজ তাহার চিরজীবনের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। যে পিতার মুখপ্রেক্ষিণী হইয়া তিনি এখনও রহিয়াছেন, যাঁহার প্রতি অবাধ্যতাচরণ করিবার কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছেন না, পাছে পিতার মনে কষ্ট হয় এই ভাবিয়া তিনি পিতার নিকট নিজের অসহ্য মনোকষ্ট ব্যক্ত করেন নাই, সেই পিতা এখন সরোজিনীর বিষয় কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন, বংশ মর্য্যাদা বাড়িবে, নিজের মান বাড়িবে, এক ঘর কুটুম্ব বাড়িবে। আর মেয়ের সুখ? মেয়ের কপালে সুখ না থাকিলে তিনি কি করিবেন!

সরোজিনী প্রথমতঃ কি করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে

পারেন নাই। নিঃসহায়া এই দুঃখ সমুদ্রে পড়িয়া এক প্রকার জ্ঞান হারা হইয়াছিলেন। সুতরাং এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছে সে সমুদায়ই কলের পুতুলের ন্যায় সম্পন্ন করিয়াছেন! এখন আসন্নকালে চেতনা হইয়াছে। দেখিলেন যে আর উপায় নাই। চারিদিকেই শত্রু—সমাজ শত্রু, পিতা শত্রু, প্রতিবেশীগণও এক প্রকার শত্রু! বালিকার প্রতি অত্যাচার করিতে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একবার ভাবিলেন সতীশের নিকট যাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন কিন্তু নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া তাহাতে ক্ষান্ত দিলেন। তখন নিরাশার বলে বলবতী হইয়া মনে করিলেন যে একবার বল প্রকাশ করিয়া দেখিবেন তাহাতে কোন ফল হয় কি না। কিন্তু হিন্দু বালিকার আবার বল কোথায়? বলের মূলপ্রস্রবণ যে স্বাধীনতা, তাহা ত হিন্দু বালিকার কোন কালেই নাই, তাহার বলের উৎপত্তি স্থান ত চিরকালই অগ্নিদগ্ধা। তবে তাহার বল আসিবে কেমন করিয়া? যদি আজ কোন পিতা যুনানী রমণীর প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইতেন তাহা হইলে আজ জগত অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিত রমণী হৃদয়ে কত বল, দেখিত সে বলের নিকট সিজারের মস্তকও অবনত হয়। কিন্তু হায়! হিন্দু রমণীর হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর স্বাধীনতা নাই। শত অত্যাচারে মুমূর্ষুরও জীবন সঞ্চার হয়, সতীত্বের জন্য সহস্র অত্যাচার পীড়িতা হিন্দু বালিকার হৃদয়েও আজ কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হইল। সতীত্বের কথা ও সাবিত্রীর জীবন চিন্তা করিতে করিতে সরোজিনীর হৃদয়েও বল আসিল। সরোজিনী এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন ও মনের বলের জন্য অসহায়ার এক মাত্র সহায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তা'ই এখন মুখে এই স্থির বিষাদ ভাব। সরোজিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া

ঘরের দরজা গুলি অর্গলবদ্ধ করিলেন—প্রতিজ্ঞা কিছুতেই দ্বার খুলিবেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরোজিনীর কোন সন্ধান নাই। তখন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। শেষে স্থির হইল এই গৃহেই সরোজিনী রহিয়াছেন। প্রথমতঃ দরজা খুলিতে অনুরোধ করা হইল, সে সমস্তই ব্যর্থ হইল। ক্রমে কর্ত্তার নিকট সংবাদ গেল। কর্ত্তা ক্রোধে, ক্ষোভে ও অপমানে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। 'মেয়ে হতে বাপের অপমান! এমন মেয়ে বেঁচে থাকায় লাভ কি?' এই বলিয়া মূর্ত্তিমান্ পাশববল অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত! আসিয়াই ক্রোধ কম্পিতস্বরে কন্যাকে দরজা খুলিতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন পাশববল পদাঘাতরূপে কবাট বক্ষে পতিত হইতে লাগিল। সে আঘাত সরোজিনীর হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে যাইয়া বাজিল। পদাঘাতের পর পদাঘাতে পাশব শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে কবাট শিথিল কলেবর হইয়া ভূতলে পড়িল। পাশব শক্তি এখানেই ক্ষান্ত হইল না, যাইয়া সরোজিনীর হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিল। দেবশক্তি পশুশক্তির নিকট পরাজিত হইল। অবলা বালিকা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, অশ্রুজল অবিরলধারে ঝরিতে লাগিল—হিন্দুবালিকা পিতৃ সমক্ষে বল প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু মেষ শিশুর ক্রন্দনে ব্যাঘ্রের হৃদয় বা বাণবিদ্ধা হরিণীর ক্রন্দনে ব্যাধের হৃদয় কোন্ কালে দয়ার্দ্র হইয়াছে? আর কোন্ কালেই বা অত্যাচারপীড়িতা হিন্দু রমণীর দগ্ধ হৃদয় নিঃসৃত উষ্ণ অশ্রুজলে হিন্দুপুরুষব্যাঘ্রের হৃদয় গলিয়াছে?

হায়! যে জাতির মুখ্যধর্ম্ম ছিল আর্ত্তজনার দুঃখ বিমো-

চন, ইহারা কি সেই জগন্মান্য আর্য্যজাতির বংশোদ্ভব? এরূপ পৈশাচিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিলে কোন্ মূর্খ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে?

সরোজিনী রোদনে কোন ফল না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আপনিই শান্ত হইতে লাগিলেন ও ভাবিলেন "জোর করিয়া বিবাহ দিলেই আমার বিবাহ হইবেনা। দেবতাই আমার সাক্ষী।" বল প্রকাশে পিতার ক্রোধ বৃদ্ধি ও অসন্তোষ ভিন্ন অন্য কোন ফল না দেখিয়া বল প্রকাশের ইচ্ছাও ত্যাগ করিলেন। তৎপরে এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল, কেবল সরোজিনী কোন মন্ত্রই উচ্চারণ করিলেন না। এবং "শুভ দৃষ্টি"র সময় চক্ষু মেলিলেন না। পুষ্প শয্যার দিন রাত্রিতে সরোজিনী সে ঘর হইতে পলায়ন করিয়া গিয়া অন্যত্র শয়ন করিলেন। পর দিন জামাতা ও সমভিব্যাহারী লোক জন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সরোজিনীকে এবার তাহার মাতার একান্ত অনুরোধে শ্বশুর গৃহে পাঠান হইল না। এদিকে আর সরোজিনীর নিন্দা রাখিবার স্থান নাই। স্ত্রীপুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মুখে সরোজিনীর লজ্জাহীনতার কথা। কেহ কেহ তদূর্দ্ধেও গমন করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইল না।

সরোজিনীর শ্বশুর গৃহে এ কথা অবিদিত রহিল না। দূরতা নিবন্ধন এ ঘটনা নানারূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল এবং কুৎসা দশ গুণ ভীষণ আকার ধারণ করিল।

আর অত্যাচার পীড়িতা সরোজিনী? পিতার অত্যাচারে তাপদগ্ধ হইয়া, প্রতিবেশীগণের তীব্র শ্লেষোক্তির মধ্যে নিজের পবিত্রতা দ্বারা পরিবৃত হইয়া পিতৃগৃহে মূর্ত্তিমতী বিষাদরূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি একাকিনী চিন্তা মগ্না থাকেন, কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ করেন না।

যখন একা থাকা কষ্টকর হইয়া উঠে তখন সতীশদের বাটিতে যান্ এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া হৃদয় মনের উন্নতি সাধন করিয়া সময়াতিপাত করেন। এখন সরোজিনীর আর সে বালসুলভ চঞ্চলতা ও প্রফুল্লতা নাই, গভীর চিন্তা সরোজিনীকে বালিকা বয়সেই বৃদ্ধা করিয়া তুলিয়াছে। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সরোজিনী সকলের সহিত একটু একটু করিয়া মিশিতে আরম্ভ করিলেন। বিষাদের গভীর কৃষ্ণ বর্ণ ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল কিন্তু সেই বালিকা বয়সের চিন্তাশূন্য প্রফুল্লতার নাচনী আর ফিরিয়া আসিল না—এখন বিষাদ শান্তিতে পরিণত হইল। এখনকার মুখের সে স্থির গম্ভীর ভাব দেখিলে সকলেরই হৃদয়ে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়, বালিকা বলিয়া আর উপেক্ষা করা যায় না। সরোজিনী আপনাকে এখনও অবিবাহিতা বলিয়া মনে করিতেন এবং চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বনে কৃতসংকল্পা হইলেন। কিন্তু সতীশের প্রতি তাহার ভালবাসা অক্ষুন্ন রহিল; বরঞ্চ জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার উচ্চতর সোপান দর্শন করিয়া সতীশকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে লইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে তাহা সতীশের কোমল হৃদয়ে বড় বাজিয়াছে। যে হৃদয় অত্যন্ত সামান্য অত্যাচার দেখিলেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, তাহা যে আজ যাহাকে আজন্ম সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিত,

তাহাকে এ প্রকার নৃশংসরূপে অত্যাচরিত দেখিয়া দ্রব হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? আজ সতীশের হৃদয় আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে! হৃদয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, নিঃসরণের পথ পাইলে বোধ হয় হৃদয় গলিয়া সমাজের অত্যাচার রাশিকে পোড়াইয়া ফেলিত! ইচ্ছা হইতেছে সমাজের হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিয়া এ ক্ষোভ নিবারণ করেন! কিন্তু নিজে বালক, এ সমাজ সংস্কারের উপযুক্ত সামর্থ্য কোথায়? তথাপি আশাও ছাড়িতে পারিতেছেন না। মনে হইতেছে 'আমার নিজের কোনও সামর্থ্য না থাকিলেও আমার পক্ষে সত্য রহিয়াছে। যদি সত্যের জয় হওয়া বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত হয় তবে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। অসত্য, অত্যাচার ও পাপ কত দিন সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে? সত্য ত চিরকাল সর্ব্বত্রই জয় লাভ করিয়াছে। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিব। অসত্য, অত্যাচার ও পাপের পৃষ্ঠপোষক সমাজের বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ ঘোষণা করিব। যদি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ হয় তাহাও এরূপ ঘৃণিত অবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা সহস্র গুণে বরণীয়।' এরূপ চিন্তাতে হৃদয় এক প্রকার শান্ত হইল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আসিয়া শোকের স্থান অধিকার করিল। সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল—বোধ হইতে লাগিল যেন অনন্তের বল আসিয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে।

সতীশ এইরূপে সমাজের কুসংস্কার ও তজ্জনিত অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ও শরতের মনের অবস্থাও অনেক পরিমাণে তদনুরূপ। প্রথম যে দিন সরোজিনী সতীশের সহিত দেখা করিতে আসিলেন সেদিন সতীশ অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না,

সরোজিনীর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। প্রথম আবেগ চলিয়া গেলে উভয়ে জীবনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। দুঃখ সরোজিনীকে জ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে, এখন সমাজ কি তাহা তিনি বিশেষ রূপেই বুঝিয়াছেন। সমাজের গঠন প্রণালীর উপর মনুষ্যের সুখ দুঃখ যে কিরূপে নির্ভর করে তাহাও বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছেন। এখন সমাজ সংস্কার লইয়া অনেক সময় তাঁহাদের মধ্যে কথা চলিত।

সতীশের প্রথম আলাপে সরোজিনীর বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। এখন সতীশকে তিনি কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন? সতীশের সহিত তাহার সম্পর্ক বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি যে চক্ষে সতীশকে পূর্ব্বে দেখিতেন সে চক্ষু আর এখন নাই। যাঁহাকে চিরকাল দাদা বলিয়া ডাকিয়াছেন, যাঁহাকে চির-কাল অগ্রজসহোদরের ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন আজ তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন এই সরোজিনীর বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অন্তরের অন্তর দেখিলে সরোজিনী সতীশকে আর দাদা বলিতে পারেন না, সেখানে তিনি দাদা অপেক্ষাও নিকটতর ও প্রিয়তর, সেখানে তিনি যাহা তাহা বলি-বার নহে—সমাজ তাহা বলিতে দেয় না। যাঁহাকে চিরকাল দাদা বলিয়াছেন তাঁহাকে আজ হঠাৎ দাদা বলা ক্ষান্তইবা দেন কি প্রকারে? আর দাদা না বলিয়া ডাকিবেনইবা কি বলিয়া? অনেক চিন্তার পর দাদা বলিয়া ডাকাই স্থির করিলেন কিন্তু দাদা বলিতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল—হৃদয়ের সমস্ত শিরা গুলি যেন খসিয়া গেল। বঙ্গকুলনারী এতদপেক্ষা বীরত্ব দেখা-ইতে আর পারে না, তাহার জীবনে এতদপেক্ষা গুরুতর আত্ম বলিদান আর নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আত্ম বলি সংসারে আর কোথায়ইবা মিলে? জানি না কোথায় মিলে।

এদিকে সতীশ বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার একজন জ্ঞাতি একদিন আসিয়া উপস্থিত। সতীশ তাঁহাকে অতি সমা-দরে বসিতে আসন দিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর আগন্তুক বলিলেন 'সতীশ, অনেক দিন ধরে তোমার মার নিকট সুরবালার বিবাহের সম্বন্ধ আন্‌ছি কিন্তু তিনি ত তোমার উপর সমস্ত ভার দিয়া বসে আছেন। এখন তুমি কি বল? সুরবালার ত আর বয়স কম হ'ল না।'

সতীশ। আজ্ঞে, যা বল্‌ছেন সে সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তবে কি না আপনাদের মতের সহিত আমাদের মত মিলে না। আমার বিবেচনায় সুরবালা এখনও নিতান্ত ছেলে মানুষ, তা'র বিবাহের বয়স হয় নাই। যদি আমার ইচ্ছা মত সুরবালার বিবাহ হয় তবে তাহার এখনও তিন চারি বৎসর বাকি।"

এই কথা শুনিয়াইত আগন্তুকের চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি অবাক হইয়া সতীশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছু-কাল পরে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "বল কি? তা'হলে কি আর জাত থাক্‌বে? তখন যে ফিরিঙ্গিমতে বিয়ে দিতে হবে।"

সতীশ। আপনাদের সহিত আমাদের তর্ক করা পোষায় না। তবে সত্য কথা বল্‌তে কি? ফিরিঙ্গি মতই হউক আর যে মতই হউক, সেইই প্রকৃত মত।

আগ। সতীশ, তুমি হ'লে কি? একেবারে খৃষ্টান্‌ হয়েছ? একথা শুন্‌লে যে তোমার বাড়ীতে কেউ আস্‌বেনা।

সতীশ। যা'সত্য বুঝ্‌ব তা কর্‌ব, তাতে যদি কেউ না আসেন, নাচার। আমিত আর লোকের মনস্তুষ্টির জন্য একটা অন্যায় কাজ কর্‌তে পারি না।

আগ। এ অন্যায় কাজ? আঠার বৎসরের সময় বিয়ে দিলে

যে বিয়ের সময় তোমার বোন্‌কে একটি ছেলে কোলে করে যেতে হবে!

এই কুৎসিত কথা শুনিয়া সতীশ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অতিথির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান একেবারে বিস্মৃত হইয়া বলিলেন "মহাশয়, বিস্তর হয়েছে। পুনরায় ওরূপ কথা মুখে আন্‌লে আপনার ভাল হ'বে না। আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান্।"

আগন্তুক এই অপমানসূচক কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন "বটে! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই কাল্‌কার সতীশ, তোর মুখে এত বড় কথা। তুই আমাকে জানিস্ না। দেখি তোর বাড়ীতে কে খায়! তোর মা ম'লে ঘরে পচ্‌বে, দেখি কে ফেলে।" এই বলিয়াইত ক্রোধভরে ধরণী কম্পিত করিয়া আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সেই দিনই গ্রামময় প্রকাশ হইল—সতীশ খৃষ্টান হইয়াছেন আর পূর্ব্ব পাড়ার ছোট রায় মহাশয়কে অপমান করিয়াছেন। সেই দিনই ঠিক হইল সতীশের বাড়ীতে আর কেহ আহার করিবে না ও তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে ঘরে ফেলিয়া পচাইবে। যে এ কথার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে 'একঘরে' করা হইবে।

এ দিকে এই গোলমাল শুনিয়া সকলে সেখানে দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে সতীশ একাকী বসিয়া আছেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শরৎ ও সতীশের মাতা কাজটী কিছু অন্যায় হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিলেন। সতীশ ও নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

সতীশের মাতা বাল্যবিবাহের দোষ বিলক্ষণ জানিতেন। যত দিন সুরবালা বিবাহের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিবেন,

ততদিন তাহার বিবাহ দেওয়া তাঁহারও অভিপ্রেত ছিল না। এখন স্থির করিলেন যে যত দিন সুরবালা বিবাহের উপযুক্ত না হয় ততদিন তাহার বিবাহ দিবেন না। সমাজ যাহা করিতে পারে তিনি তাহা অবাধে সহ্য করিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একদিন বিকালে শরৎও সতীশ, সুরবালা ও গিরিবালাকে লইয়া বাটীর দক্ষিণস্থ ময়দানে বেড়াইতে গেলেন। যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। যে স্থানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে তথা হইতে মন্দ মন্দ সান্ধ্য-সমীরণ আসিয়া তাঁহাদিগের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সকলেরই মন প্রফুল্ল, বক্ষঃস্ফীত। চঞ্চলা গিরিবালা মধ্যে মধ্যে দৌড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে একবার শরতের, একবার সতীশের গলা ধরিয়া ঝুলিতেছে। তাহার চঞ্চল কেশরাশি তাহার চঞ্চল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার এ পাশ, একবার ওপাশ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে যেন ক্লান্ত হইয়াই মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম লাভের আশায় তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিতেছে। গিরিবালা বাধ্য হইয়া খেলায় ক্ষান্ত দিয়া তাহাদিগকে যথা স্থানে স্থাপিত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য তাহাদের শ্রান্তি দূর করিতেছে।

যাইতে যাইতে সুরবালা শরতের হস্তধারণ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হাঁ শরৎ দাদা, তোমাদের কল্‌কাতার মেয়েরা নাকি বড় বাবু? কাজ কর্ম্ম করে না,

পাত্‌লা কাপড় পরে আর রাত দিন বসিয়া চুল পাট করে ?” শরৎ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ‘কেন, সুরবালা, তা’তে দোষ কি ?’ সুরবালা এবার কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন ‘দোষ কি ? ইহার সবইত দোষ।—এ্যা, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। ওই যে তুমি হাস্‌ছ।’

শরৎ। কেন, হাস্‌লেই কি ফাঁকি দেওয়া হয় ?

সুর। ফাঁকি দিলে কি আর বোঝা যায় না !—আমি বাবু মেয়ে দেখ্‌তে পারি না।

শরৎ একবার সুরবালার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন মুখখানি সরলতা মাখান। অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন ‘কল্‌কাতার মেয়েরা প্রায় সকলেই বাবু আর অলস। সেই জন্য তা’দের ব্যামও ছাড়ে না। তবে সবই খারাপ না, ভালও আছে।’ এইভাবে তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে একটা পাখী ‘ক্যা-এ্যা ক্যা-এ্যা’ শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে ছট্ ফট্ করিয়া মাটিতে পড়িল। সুরবালা ‘আহা-হা’ বলিয়া পাখিটি লইতে দৌড়াইলেন, অপর সকলেও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমন সময় একটা বেদে আসিয়া পাখীটি লইয়া তাহার থোলেতে পূরিল। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন পাখীটির পড়িবার কারণ কি ! সুরবালা বিফলযত্ন হইয়া বেদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে দুইটি অশ্রুবিন্দু তাহার নয়ন প্রান্তে দেখা দিল, ক্রমে তাহারা গড়াইয়া তাহার কপোল দেশে পতিত হইল। শরৎ ইহা দেখিতে পাইলেন। তিনি অশ্রুর মূল্য বুঝিতেন, বলিলেন ‘সতীশ, এ অশ্রুজলে যে সুগন্ধ আছে তাহা সংসারের কোনও বস্তুতেই নাই।’

তাঁহারা এই দুর্ব্বৃত্ত বেদের নিষ্ঠুরতার কথা বলিতে বলিতে

একটি পরিষ্কার স্থানে যাইয়া বসিলেন। তখন গিরিবালা ‘শরৎ দাদা, তোমার গলায় বড় ঘামাচি হয়েছে, বস গেলে দি’ এই বলিয়া ঘামাচি গালিতে বসিল। সুরবালা একটু আমোদ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন ‘না গিরি, তুই ঘামাচি গাল্‌তে পারিবি না, আমি গাল্‌ব।

গিরি। দেখ শরৎ দাদা, দিদি আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আস্‌ছেন। আমি কিন্তু ওর চুল খুলে দিব এখন।

সুরবালার তাহাতে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল না সুতরাং তিনি ঘামাচি গালিতে লাগিলেন। গিরিবালা তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার চুল খুলিয়া দিল আর তাহার ছোট হাত খানা দিয়া একটি ছোট গোচের কিল তাহার পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল।

সুর। আচ্ছা, তুমি আমার চুল খুলে দিলে আর আমাকে মার্‌লে ! দেখি তুমি কার সঙ্গে খেল। যাই, আমি দাদার ঘামাচি মারি গিয়ে। এই বলিয়া তিনি সতীশের ঘামাচি মারিতে গেলেন।

গিরি। তুমি না খেল্‌লে বুঝি আমি আর খেল্‌তে পাব না ? দাদা আর শরৎ দাদার সঙ্গে খেল্‌ব।

সুর। ওঁয়ারা আর কদিন বাড়ী থাক্‌বেন ? তার পর ? গিরিবালা বুঝিতে পারিল যে তাহার দিদি ভিন্ন গতি নাই। ‘না দিদি, তুমি রাগ করনা। আমি কি আর তোমাকে সত্য সত্যই মেরেছি। ও একটু আদর করেছি বইত নয়।’

সুর। এখন আদর হবে বৈকি ! তা মজা দেখাব।

তখন গিরিবালা একটু নাকি সুরে বলিল ‘দেখ শরৎ দাদা, দিদি আমার সঙ্গে খেল্‌তে চায় না।’

শরৎ। তুমি ওকে মার্‌লে কেন ?

গিরিবালা এবার ফাঁফরে পড়িল। কাজেই দিদির কাছে

মাপ চাওয়া ভিন্ন আর গতি নাই দেখিয়া বলিল "দিদি, আমি আর তোমাকে কখনও মার্‌ব না। এখন আমায় নিয়ে খেল্‌বে?"

সুর। খেল্‌ব।

এইরূপে এ বিবাদ একপ্রকার আপোষে নিষ্পত্য হইয়া গেল। তাঁহারা সকলে বসিয়া আছেন। শরৎ সরোজিনীর বিবাহের বিষয় ভাবিতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন তাহাদের শরীরে কে যেন হরিদ্রা বর্ণের সৌন্দর্য্য রাশি ঢালিয়া দিয়াছে। চারি দিকে চাহিয়া দেখেন জগৎ সেই জ্বল্ জ্বল্ তরল সৌন্দর্য্যস্রোতে ভাসিতেছে। একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, একবার প্রকৃতির মুখ দেখিলেন—দেখিলেন অনন্ত আকাশ অনন্ত বাহু প্রসারণ করিয়া নিদ্রিতা প্রকৃতিকে বেষ্টন করিয়াছেন এবং তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন। প্রকৃতি এই সুখস্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছেন। উভয়েরই মুখে মৃদু হাসি প্রকটিত হইয়াছে। এই হাসির প্রভাতেই জগৎ ভাসিতেছে। এ দৃশ্য শরতের প্রাণের কবাট খুলিয়া দিল—সমস্ত সৌন্দর্য্যস্রোত তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি এই অনন্ত প্রীতি উপভোগ করিতেছেন আর মুগ্ধ সুরবালা তাঁহার মুখের দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন। শরৎ বলিয়া উঠিলেন—"আহা! প্রকৃতির মিলন কি সুন্দর, কি মনোরম, কি পবিত্র! প্রকৃতির বিবাহে সকলেই সমান সুখী, সকলেরই মুখে সমান হাসির জ্যোতি! ইহাতে দুই হৃদয় এক হইয়া যায়, দুই প্রাণে একই স্রোত বহিতে থাকে। এ মিলনে এক প্রাণ উঁকি দিয়া অপর প্রাণের মূল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। ইহা স্বচ্ছ, ইহা পবিত্র। এই মিলনই স্বর্গের সোপান। ঈশ্বরই ইহার শেষ লক্ষ্য।" মুগ্ধা সুরবালার চক্ষু এখনও শরতের মুখমণ্ডলে স্থাপিত, যেন চক্ষু দিয়াই তাহার সমস্ত কথা পাণ করিতেছেন। শরতের

দৃষ্টি সুরবালার উপর পতিত হইল, তাহার নিশ্চল চক্ষু দুইটি দেখিলেন—দেখিলেন বটে কিন্তু তাঁহার চক্ষুও আর ফিরিল না। এই মুগ্ধা মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ততোঽধিক মুগ্ধ হইলেন। কে জানে কতক্ষণ তাঁহারা এ ভাবে বসিয়া রহিলেন?

মাতা ভগিনীর অতুল স্নেহ সমুদ্রের মধ্যে সতীশের একমাস ছুটী পরম সুখে কাটিয়া গেল। শরৎ যাহা কখনও বঙ্গ সমাজে পাইবার আশা করেন নাই—যাহা কেবল কল্পনাতেই উপভোগ করিয়া স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ মনে করিতেন সেই অকৃত্রিম স্বাধীন ভালবাসা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া অবধি এক দিনও "ভদ্রতার খাতির" পান নাই, এখানে কেহ তাঁহাকে "সৌজন্য" দেখায় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শরৎ তথাপি ভাবিতেছেন "এমন সুখ আর কখনও পাই নাই, আর কখনও পাইব না।" শরৎ এখানে আসিয়া অবধি এক দিনের জন্যও ইহাকে পরের বাড়ী বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। কলিকাতায় যাইবার সময় সকলেই সাশ্রুনয়নে আসিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সাশ্রুনয়নে নৌকায় উঠিলেন। প্রত্যেকেই শরৎকে পুনরায় সতীশের সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন, তিনিও আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আজ তাহাদের চক্ষে গৃহ শূন্য শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত জগৎ নিরানন্দময়। আজ প্রকৃতির মুখে যেন কালিমা পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে গিরিবালা আর থাকিতে পারিল না—সুর ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালের স্রোতে ক্রমে দুই বৎসর গড়াইয়া পড়িল। সরোজিনী এখন ষোলবৎসরের। তাহার দৈনিক কার্য্য—পিতার গৃহকর্ম্ম, নিজের পড়া ও চিন্তা, আর অবসরমত সুরবালাদের বাটীতে যাইয়া প্রাণের মত সঙ্গিনীর সহিত কথোপকথন। সরোজিনী হাস্য পরিহাস ও বৃথা গল্প ভাল বাসিতেন না বলিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা তাহাকে গর্ব্বিতা মনে করিয়া বড় একটা কাছে আসিতেন না, তিনিও তাহাদের সংসর্গে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিতেন না। এজন্য সরোজিনী অধিকাংশ সময়ই নিজের গৃহ মধ্যে আবদ্ধা থাকিতেন। এদিকে শ্বশুর গৃহ হইতে তাহাকে লইবার জন্য অনেকবার লোক আসিয়াছে কিন্তু সরোজিনীর একান্ত অনিচ্ছা বশতঃ পাঠান হয় নাই। অবশেষ তাহার স্বামী (?) পালকী বেহারা লইয়া স্বয়ং উপস্থিত। কর্ত্তা দেখিলেন যে যদি এবার পাঠান না হয় তাহা হইলে তাহারা আর কন্যা লইতে আসিবেন না। জামাতার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হইল। কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন। গৃহিণীরই মহাবিভ্রাট। তিনি যত দূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ বোধগম্য হইয়াছে যে সরোজিনী কিছুতেই যাইতে সম্মত হইবে না। তথাপি কি করেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ও কর্ত্তার কথা না শুনিলেও নয় বলিয়া কন্যার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক বুঝাইয়া বলিলেন "দেখ মা, জামাই তোমাকে নিতে এসেছেন, এখন যদি না যাও তা'হলে তিনি তোমাকে ত্যাগ কর্‌বেন। তখন তোমার কি দশা হ'বে? আমার লক্ষ্মী মা, তুমি একবার

যাও, আমি শীঘ্রই আবার নিয়ে আস্‌ব।" মাতার একথা শুনিয়া সরোজিনী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন কিন্তু স্নেহময়ী মাতার উপর কে কোন্ কালে রাগ করিতে পারে? সরোজিনী শান্ত ভাবে বলিলেন "শোন মা, আমাকে অনেকবার ঐ কথা লইয়া জ্বালাইয়াছ। আমার মাথা খাও আমাকে ও রকম কথা আর কখনও বলিওনা। আমার কখনও বিবাহ হয় নাই, আমার স্বামী কেহ নাই। যদি তোমরা আমাকে যাহার তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও, তা'হলে আমি হয় আত্মঘাতিনী হ'ব, না হয় গৃহত্যাগ কর্‌ব। মা, আমার মাথা খাও, আমাকে এরূপ পাপ কার্য্যে কখনও লওয়াইও না।" গৃহিণী আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ত্তার নিকট যথাযথ সমস্তই বিবৃত করিলেন। কর্ত্তা শুনিয়াইত প্রথমে রাগিয়া উঠিলেন কিন্তু গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন "তুমি সরোজিনীকে জান না। যদি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পাঠাইয়া দেও তা'হলে নিশ্চয়ই সে যা বলেছে তাই কর্‌বে। সে যদি নাই যায় তা'হলে কি তুমি আর একটা মেয়েকে এক মুঠ খেতে দিতে পারবে না? আমার প্রাণ থাক্‌তে তুমি আমার মেয়েকে নিতে পার্‌বে না।" গৃহিণীর চক্ষুজলে কর্ত্তার ক্রোধাগ্নি নিবিয়া গেল। গৃহিণীর অমতে এ কাজ করিতে সাহসও করিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তবে তোমার মেয়ে নিয়ে তুমি থাক। আমি জামাইকে এই কথা বলি গিয়ে।" কর্ত্তা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। জামাতা আমূল সমস্ত কথা শুনিয়া রাগিয়া লোক জন সমেত তৎক্ষণাৎ গৃহে গেলেন। এক পক্ষের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে জামাতা অন্যত্র বিবাহ করিয়াছেন। এ সংবাদে কর্ত্তা ও গৃহিণী কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন বটে কিন্তু সরোজিনী ভাবিলেন যে আর কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে

আসিবেনা। তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কার্য্যে মন দিলেন।

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" আর্য্যঋষিরা এই যে মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন মনোহরপুর এই সময়ে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে লাগিল। তথাকার কুৎসিত প্রকৃতির লোকেরা সরোজিনী ও সুরবালা সম্বন্ধে দিন দিন নূতন নূতন কুৎসা রটাইতে লাগিল! তাহাদের কুৎসিৎ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বনেও ত্রুটী করে নাই। কিন্তু পবিত্রতা সর্ব্বদাই স্বরক্ষিতা। অগ্নিই তাহার পরীক্ষাস্থল। সীতা অগ্নিপরীক্ষার পর সর্ব্বসমক্ষে উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। স্বর্ণ অগ্নিপরীক্ষার পর বিশুদ্ধতর হয়। সরোজিনী ও সুরবালার পক্ষেও ঠিক তাহাই হইল। পবিত্রতা জয়লাভ করিল। সময়ে তাহাদের চরিত্রমহিমা সর্ব্বসমক্ষে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল আর দুষ্ট লোকের মুখে কালী পড়িল।

ইতিমধ্যে সুরবালার মাতা নিজ গৃহে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সরোজিনী ও সুরবালার সাহায্যে তিনি বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা "খৃষ্টান" বলিয়া অনেকে আপনাপন কন্যাদিগকে তথায় পাঠান নাই কিন্তু বিনা ব্যয়ে কন্যাকে বিদ্যাবতী করার প্রলোভনটা ত্যাগ করাও তত সহজ নহে—বিশেষতঃ বিয়ে দিতে আজ কাল মেয়ের লেখাপড়া জানা আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে পাড়ার প্রায় সমস্ত বালিকাই সতীশের মাতার স্কুলে পড়িতে আসিত। তাহাদিগকে বৎসরান্তে পারিতোষিক দেওয়ার ভারটা সতীশ স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন।

এ বৎসরও এইরূপে কাটিয়া গেল। এই বৎসরের শেষে সতীশ এম্,এ ও শরৎ বি,এল্ পরীক্ষা দিয়া মনোহরপুরে আসিলেন।

বালিকা দিগকে পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক দিলেন। তাহাতে বালিকারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষেরাও ভারি সন্তুষ্ট, কারণ একে বেতন লাগে না, তাহাতে আবার পুরস্কার! সুতরাং এবৎসর শিক্ষার্থিনীদিগের সংখ্যা বাড়িল। সতীশ ও শরৎ অবকাশের সময়ে মনোহরপুরে আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে যাইয়া বক্তৃতাদি দিতেন ও যাহাতে লোকের শিক্ষার প্রতি আসক্তি হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদিগের বিপরীত মত থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগুণে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন। এইরূপে অবকাশ সময় অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় গেলেন। সুরবালা অন্যান্য বার যেভাবে শরৎকে বিদায় দেন এবার তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য অনুভব করিলেন—এবার যেন শরৎকে বিদায় দিতে বেশী কষ্ট হইল। যাহাহউক পুনরায় বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্য দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী এক দিন একাকিনী বসিয়া নিজ জীবনের বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতেছেন তাহার এ অবস্থা কে করিল? যে সতীশকে তিনি অন্তরের অন্তরে পূজা করেন, যাঁহাকে দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন, যাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলে স্বর্গ সুখ মনে করেন; তাঁহাকে তিনি ইচ্ছামত দেখিতে পান না কেন? সতীশের গলা ধরিয়া প্রাণের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে

পারিলে যে হৃদয়ের সমস্ত ভার অপসারিত হয় মনে করেন তাহা তিনি পারেন না কেন? কে তাহার এ বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক? সমাজ তাহার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত অভিলাষ হরণ করিয়াছে। সমাজ তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহার আত্মার অনন্ত উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছে—তাহাকে এই অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়াছে। এ সমাজের কি আর প্রতিকার করা যায় না? সমাজের অবস্থা কি চিরকালই এরূপ থাকিবে? সরোজিনীর নৈরাশ্য মাখান আশা এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিল না।

সরোজিনী আবার ভাবিলেন যে প্রকৃত পক্ষে তাহার ত বিবাহ হয় নাই, তিনি ত আজও কুমারী, তবে কি তিনি এখন সতীশকে বিবাহ করিতে পারেন না? তাহা হইলেই ত তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন। তবে ইহা কি পাপ? ইহা কি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ? কিন্তু পাপ কি? ধর্ম্ম কি? যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ তাহাই পাপ আর যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহাই ধর্ম্ম। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ হওয়া কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? একথা তিনি কিছুতেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলেন না। যদি ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয় তবে এরূপ বিবাহ পদ্ধতি ভঙ্গ করিলেই বা পাপ কেন হইবে? এতদ্দারা এক প্রকার স্থির হইল যে সতীশকে বিবাহ করা পাপ নয়। তবে তিনি সতীশকে বিবাহ করিতে পারেন না কেন? সমাজ প্রতিবন্ধক। তাহা হইলে সমাজ তাহাকে কুলটা বলিবে। ইহা তাহার সহ্য হইবে না। ইহা সমাজনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সমাজ ত মনুষ্যকৃত। মনুষ্যের অন্যায় নিয়ম প্রতিপালন না করাতে কোনও পাপ হইতে পারে না সত্য—তবে মনুষ্য সমাজে থাকিতে হইলে সে সমাজের প্রধান নীতি গুলি প্রতিপালন করা আবশ্যক।

এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে তাহার একটি বাল্যসহচরীর মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়াই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। চিন্তাস্রোত এখন নিজ বিষয় ত্যাগ করিয়া সহচরী সম্বন্ধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক এক করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কথাই মনে আসিতে লাগিল। এত অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হইল কেন? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সরোজিনীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। বুঝিলেন অভাগিনীর মৃত্যু কেন হইয়াছে। সমাজের করাল-কবোলে আর একটি অসহায়া, অত্যাচরিতা পতিত হইয়াছে। শেষ বিদায়ের কথা মনে হইল—মনে হইল কিরূপে তিনি সাশ্রু-নয়নে বিদয় কালে বলিয়াছিলেন "ভাই সরো, আমার স্বামী আমাকে যে চক্ষে দেখেন তাহা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়—ইচ্ছা হয় বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করি। আমাদের সতীত্ব কেবল বাহিরের লোকের নিকট।" এই কথা মনে করিয়া তাহার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। হিন্দুসমাজের অনন্ত দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এখন হিন্দুসমাজে সতীত্ব একটা কথা মাত্র—ইহা এখন জীবন বিহীন।

ইত্যবসরে আমি পাঠক মহাশয়দিগকে এই মৃতা যুবতীটির কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিব। ইনি সরোজিনীর প্রতিবেশী কন্যা। বাল্যকালে এক সঙ্গে খেলা করিতেন। একটি অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুবকের সহিত ইহার বিবাহ হয়। প্রথমতঃ ইহার কোনও কষ্ট হয় নাই। কিন্তু যখন শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্বামী সহ-বাস করিতে লাগিলেন তখনই স্বামীর বিদ্যা বুদ্ধি জানিতে পারিলেন। দূর হইতে যে আশ্রয় তরুকে চন্দন বৃক্ষ মনে করি' তেন, তাহা বিষ বৃক্ষে পরিণত হইল। স্বামী একে অশিক্ষিত, তাহাতে মদ্যপায়ী ও অসচ্চরিত্র। এরূপ অবস্থাতে যে স্ত্রীর

কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। স্ত্রীর সহিত তাহার যে সম্পর্ক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি স্বামীর চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নানা প্রকার চিন্তা ও মনস্তাপে শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। তৎপরে পিতৃগৃহে আসিলেন, ভাবিলেন আর সে নরকে যাইবেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে তাহার নিজের শরীরের উপর তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই—উহা অপরের ভোগ্য বস্তু। এ বিষয়ে হিন্দু রমণী পশু অপেক্ষাও হীন। পিতৃ গৃহে থাকার চেষ্টা বিফল হইল। পুনরায় স্বামী (?) গৃহে যাইতে হইল। অল্প দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে তিনি এই দুঃখ যন্ত্রণা পূর্ণ হিন্দু রমণীর জীবনকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সরোজিনী বর্ত্তমান সময়ের সমাজের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে পুরাতন ভারতের অবস্থা মনে করিলেন—মনে করিলেন, পুরাতন ভারতে সতীত্বের কি উচ্চ আদর্শ ছিল—সতীত্বের কি আদর ছিল। তখন স্ত্রী জাতির কিরূপ অবস্থা ছিল, আর এখনই বা কি হইয়াছে! উভয় অবস্থার পার্থক্য চিন্তা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন। মনোভাব হৃদয় মন ছাপাইয়া দুই স্রোতে বাহির হইতে লাগিল—পবিত্র অশ্রুজল সেই পবিত্র বদন ও বক্ষ ভাসাইয়া পৃথিবীকে শীতল করিল আর নিস্তব্ধ প্রকৃতিদেবীকে কাঁদাইয়া, করুণরসে জগৎ ভাসাইয়া সঙ্গীত স্রোত প্রবাহিত হইলঃ——

লগ্নী——যৎ

হায় মা, ভারত, একি দশা তব,
দেখিলে বিদরে হৃদয় রে॥

পুরুষ সমাজ, করে অত্যাচার
অবলা সমাজ উপরে রে।
কেহ নাহি এবে, করিতে উদ্ধার
সমাজ পীড়িতা রমণীরে॥
হিন্দু পিতাগণ, করেন গণন
স্নেহ স্বার্থ অনুসারে রে।
কন্যা সন্তান, নাহি পায় স্থান
সহ পুত্র পিতৃ হৃদয়ে রে॥
(তা'র) বিবাহ বিষয়ে, নাহি অধিকার;
নাহি অধিকার নিজ দেহে রে।
হিন্দু রমণী, স্বামী সেবাদাসী,
কিন্তু শক্তি হীনা স্বামী বরণে রে॥
সতীত্বের আদর, নাহিক ভারতে;
নাহিক পবিত্র প্রেমধন রে।
দাসত্ব এখন নারীর জীবন,
প্রেমে, ধর্ম্মে আর পাণি দানে রে॥
স্বাধীনতা বিনা, কোথা ভালবাসা?
ভালবাসা স্বাধীনতাপ্রাণা রে।
ভারত এখন ঘোর মরুভূমি,
স্বাধীনতা, ভালবাসা বিনা রে॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এক দিন সতীশ আহারাদির পর শয়ন করিয়া সেলীর কবিতা পড়িতেছেন। এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া হাতে একখানি পত্র দিল। বাহিরে সরোজিনীর হস্তাক্ষর দেখিয়াই অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পত্রখানি খুলিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু সুখী হইলেন কি দুঃখিত হইলেন মুখ দেখিয়া বলিতে পারা যায় না, তবে বিশেষ ব্যগ্রতার চিহ্ন মুখে দেখা গেল। শেষ অতি ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন—স্থানে স্থানে দুই তিনবার পড়িয়াও যেন তৃপ্ত হইতেছেন না, স্থানে স্থানে চিন্তা করিতেছেন। আমি আর পাঠকমহাশয়দিগকে সেরূপ ভাবে বিরক্ত না করিয়া পূর্ণ পত্রখানি উপহার দিতেছি।

"সতীশ! আজিকার সম্বোধন দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ কি? আজ সম্বোধনের প্রথম ও শেষ বিবর্জ্জিত হইয়াছে। আজ প্রাণের ভিতর একটি নূতন আবেগ আসিয়াছে, তজ্জন্যই পত্র লিখিতেছি ও এই নূতন প্রকার সম্বোধনের কারণও তাহাই। তোমাকে আর দাদা বলিতে ইচ্ছা হয় না। কেন? পরে ব্যক্ত হইতেছে। তোমাকে চিরকাল "প্রিয়—" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি কিন্তু আজ আর তাহাতে মন উঠিতেছে না। কেন? জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে যাঁহাকে আজ প্রায় চারি বৎসর দিন রাত্রি প্রাণের মধ্যে পূজা করিয়া আসিতেছি, তাঁহাকে যেন অন্যের সহিত সমান সম্বোধন করিলে প্রাণ জুড়ায় না, যেন কত কি বলিতে বাকি রহিয়া গেল। একটা বিশেষণ লইয়া এত গোলযোগ কেন? "সতীশ" নামটি আমার নিকট

এত সুমধুর, এত পবিত্র, এত যাহা-কথায় প্রকাশ হয়-না-তা'ই, যে শত সহস্র বিশেষণ দিলেও তাহার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তথাপি কেন একটা বিশেষণ লইয়া বকিয়া মরিতেছি? দুর্ব্বলতা? তাহাই। এখন হইতে তোমাকে 'প্রাণের সতীশ' বলিলে কি তুমি রাগ করিবে?

আমি আজ এত পাগলের ন্যায় বকিতেছি কেন? উত্তর, আমি প্রকৃতই পাগল। কিন্তু পাগল কি? আমার বিবেচনায়, যে জ্ঞানের দ্বারা না শাসিত হইয়া কেবল ভাব বিশেষদ্বারা চালিত হয়। আমিও আজ ভাব বিশেষেরদ্বারা শাসিতা—আজ আমার জ্ঞান ভাব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে—আজ আমি পাগল হইয়াছি। সতীশ! আশা করি তুমি আমার এই বালসুলভ চঞ্চলতা ক্ষমা করিবে। আমি অনেক চিন্তা করিয়াছিলাম। প্রাণকে অনেক বুঝাইলাম যে ইহা দুর্ব্বলতা, কিন্তু প্রাণ কিছুতেই শুনিল না,—আমার কোনও বারণই মানিল না। তাহার বড় সাধ যে তোমার গলা ধরিয়া একবার প্রাণের মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া দিবে—কথা কহিবে না, নড়িবে না—অচল বায়ুতে সৌরভের ন্যায় একবারে মিশিয়া যাইবে! এ সাধ কেন হইল? যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জানেন—কেন হইল।

ভালবাসা কি? এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অনেকে অনেক প্রকার উত্তরও দিয়াছেন, অনেকে তাহা পড়িয়াছেন। কিন্তু বুঝেন কে? কেহ কেহ বলিবেন যাহার মাথা পরিষ্কার তিনিই বুঝিতে পারেন। আমি সে কথা স্বীকার করি না। হৃদয়ের জিনিষ মাথা দিয়া কি বুঝিবে? আমার বিবেচনায় যে ভালবাসিয়াছে, সেই ভালবাসা চিনে; অন্যের সাধ্য নয় যে তাহার কপর্দ্দকও বুঝিতে সক্ষম হয়। ভাষা পত্র বাহক। পত্রবাহককে দেখিলে পত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়

না ;—ভাষা দেখিলেও ভাব জানা যায় না। ভাব ভাবুকের অন্তরে বাস করে, কদাচ বাহিরে আইসে না। ভাষা সাটমাত্র। সাট দেখিয়া ভাবুক ভাবুকের অন্তর পাঠ করেন ; যাহারা সাট চিনে না, তাহারা ভাষা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। তা'ই ভালবাসার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা পাইব না।

ভালবাসায় কি লাভ ? ঈশ্বর জানেন, সুখ কি দুঃখ। লাভালাভ গণনা করিয়া কেহ কখনও ভাল বাসে না, ভাল বাসিতে পারেও না। লাভালাভ গণনা যেখানে ভালবাসা তাহার কাছেও থাকিতে পারে না। তাই বলিয়া যে ভালবাসার কোনও লাভ নাই একথা আমি বলি না। ভালবাসায় লাভ—অনন্ত তৃপ্তি বা অনন্ত অতৃপ্তি। আরও লাভ আছে। ভাল বাসিলে হৃদয় প্রশস্ত হয়, হৃদয় কোমল হয়, আর নিজের হৃদয়কে পরের করিয়া দেয়, অথবা পরের হৃদয়কে আপনার করিয়া লয়। কিন্তু আমরা আবার ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা চাই কেন? প্রতিদানে ভালবাসা পাইলে সুখী, না পাইলে দুঃখিত হই কেন ? সুধু তাহাই নহে, আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে অন্তর দেখাইতে—তাঁহাকে নিজের ভালবাসা জানাইতে এত উৎকণ্ঠিত হই কেন ? আজ তোমাকে পত্র লিখিতে এ হৃদয় এত পাগল হইয়াছে কেন ? ঈশ্বর জানেন ; কেন। ইহা কি দুর্ব্বলতা ? হ'তে পারে, কিন্তু আমিত পাগল ! আমার সে জ্ঞান নাই। আমার যখন যাহা মনে হয় তাহা প্রকাশ করিয়া মন খালি করিতে পারিলেই বাঁচি।

সতীশ ! আমার উপর রাগ করিও না। আমি নির্ব্বোধ। যখন যে দোষ দেখিবে, যখন যে ভুল দেখিবে বুঝাইয়া দিও। আমি সমাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিতে বাসনা করি না। তা'ই বলিয়া মারিলেও কি একবার কাঁদা দোষ ? তোমাকে ভালবাসি, কারণ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না ; তোমাকে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলিতে ইচ্ছা হয় ; এ ইচ্ছা কেন হয় তাহা জানি না। ইহাতে কি সমাজের ক্ষতি হয় ? যদি কোন দোষ হয় তাহার জন্য দায়ী জগদীশ্বর, আমি ত দুর্ব্বল !

তোমার সরোজিনী।

সতীশ অতি ধীরে ধীরে পত্র খানি পাঠ করিলেন। পাঠ কালে শরীর মধ্যেমধ্যে শিহরিয়া উঠিতে ছিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইতে ছিল, আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইতেছিল, যেন রক্ত চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। পাঠ শেষ হইলে সতীশের বক্ষঃস্থল ক্রমে স্ফীত হইল, ক্রমে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, ক্রমে শরীর অসাড় হইয়া পড়িল। চক্ষু নিশ্চল, শরীর নিশ্চল, সতীশের সমস্ত জ্ঞান লোপ হইল। শরীর নাড়িবার শক্তি নাই—ইচ্ছাও নাই। শরীর অত্যন্ত ভারি কি অত্যন্ত হালকা হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছেন না। কোথায় আছেন, কি করিতেছিলেন, কি করিবেন—সে জ্ঞান নাই। কেবল একমাত্র চিন্তা সরোজিনী। তিনি অন্তরে বাহিরে সরোজিনীকে দেখিতেছেন—বোধ হইতে লাগিল যেন সরোজিনী তাহার প্রত্যেক রক্ত বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছেন। বোধ হইতে লাগিল যেন সরোজিনী বাতাস হইয়া গিয়াছেন ও তাঁহার নাসিকা দ্বার দিয়া প্রাণের ভিতর অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছেন। সরোজিনীকে একেবারে প্রাণের ভিতর পুরিবার আশায় জোরে নিশ্বাস টানিলেন। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার বা জ্ঞান লোপ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সকল কথা স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল—তাহার সমাধি ভঙ্গ হইল।

এই ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সতীশ কাগজ কলম লইয়া সরোজিনীকে পত্র লিখিতে বসিলেন, লিখিলেন :—

প্রাণের সরোজিনী।

তুমি আজ কথা পাড়িয়াছ, না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। তোমার প্রত্যেক অক্ষর আমার প্রাণে যে ঢেউ তুলিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার প্রাণের মধ্যে যে প্রতিমা রহিয়াছে তাহা দেখিবে? এস, কিন্তু হায়! মানব চক্ষু প্রাণ দেখিতে অক্ষম!

তোমার যে বাসনা হয় তাহা প্রেমিক মাত্রেরই হইয়া থাকে। কিন্তু এই পাপদুঃখময় সংসারে কাহার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে? যদি পবিত্র বাসনা চরিতার্থ হওয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয় তবে নিশ্চয়ই আমাদের এ বাসনা ইহ জীবনেই হউক আর পর জীবনেই হউক চরিতার্থ হইবে।

একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ, আমরা ভাল বাসার প্রতিদান ভালবাসা চাই কেন? মনুষ্যের স্বভাব। তবে সুক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে ইহার দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণ দৃষ্ট হয়। প্রথম আমরা যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে, তাঁহার প্রাণ দেখিতে ও তাঁহাকে প্রাণ দেখাইতে পারিলে আমাদের সুখ হয়। কেন? ইহা ভালবাসার স্বভাব। প্রতিদানে ভালবাসা না পাইলে এ সমস্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। ইহা এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অবিচ্ছেদ্য উপায় মাত্র। ইহাই প্রতিদানে ভালবাসা আকাঙ্ক্ষার মহত্তর কারণ। দ্বিতীয় কারণ, বোধ হয়, এই যে আমরা যাঁহাকে ভালবাসি তাহার মত আমাদিগের নিকট সমধিক গুরু বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং যদি আমার প্রিয়ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন তাহা হইলে ইহাও এক প্রকার প্রমাণিত হইল যে আমি অন্ততঃ তাঁহার চক্ষেও ভাল। এই আত্ম গরিমাই বোধ হয় এই প্রতিদান আকাঙ্ক্ষার অপর কারণ। দ্বিতীয় কারণটী নীচ-

প্রকৃতি বিশিষ্ট! ইহা প্রকৃতি বিশেষে ভাল বাসার প্রারম্ভে দেখা দেয় কিন্তু ভালবাসা গাঢ়তর হইলে ক্রমে দূরে পলায়ন করে।

এই প্রতিদান আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহান্। এ উদ্দেশ্য প্রথম কারণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাই আত্মার অনন্ত উন্নতির সুবর্ণ সোপান। স্ত্রী পুরুষের আত্মা পৃথগবস্থায় অপূর্ণ, অর্দ্ধবিকশিত। এ দুয়ের সমবায়েই আত্মার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। এ সমবায়ের মূলে এই প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা বা আসঙ্গ লিপ্সা। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও এই আত্মার পূর্ণতা। অতএব চক্ষু থাকিলে দেখা যায় যে এই আসঙ্গ লিপ্সার মূলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। যত দিন মানবাত্মা পূর্ণ না হইবে তত দিন এআকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই।

সমাজ আমাদিগের এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে বাধা দিয়া আমাদের আত্মার উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছে। যদি আত্মা অনন্ত হয়, যদি আমাদের আত্মার অমরতাতে বিশ্বাস থাকে, তবে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের কয়েকটি দিন কাটিয়া যাইবে, তারপর যেখানে সমাজের অত্যাচার নাই, মনুষ্যের স্বাধীনতা হরণ করিতে কেহ নাই, সেই রাজ্যে যাইয়া আমাদের বাসনা চরিতার্থ করিব।

যত দিন মনুষ্য সমাজে থাকিতে হইবে, তত দিন তাহার সর্ব্বপ্রধান নীতিটি উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার সহিত আমার আর ইহজীবনে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইবার আশা করা সমাজনীতি সঙ্গত নহে। এখন এস, আমরা দেশেরও সমাজের কার্য্য করিয়া এক হই। আমাদের জীবনের অনেক সুখ ত সমাজ নষ্ট করিয়াছে; এখন এস, চেষ্টা করি আর কাহারও সুখ যেন এরূপে দগ্ধ না হয়।

তোমারই সতীশ—

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশের মাতা পুত্র কন্যা গুলিকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। বালিকা বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভারি আনন্দ। বালিকা গুলি তাঁহার এত অনুগত যে তিনি কোন কার্য্য মন্দ বলিলে তাহারা প্রাণান্তেও তাহা করিতে সম্মত হইত না। এইরূপে ভাল বাসা দ্বারা অনুশাসিত হইয়া বালিকাগুলির স্বভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে তাহারা কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। সকলেই পরস্পর সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিত, ঝগড়ার নাম মাত্রও ছিল না।

সতীশের মাতা আর একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া যুবতী ও প্রৌঢ়াদিগকে শিক্ষার মহোপকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমে তাহাদিগের শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহারা আহারাদির পর কোনও বাড়ীতে একত্র হইবেন, এবং তিনি যাইয়া তাহাদের শিক্ষা দিয়া আসিবেন। সরোজিনী ও সুরবালা তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিতেন। এইরূপে যুবতীরা মধ্যাহ্নকাল তাষ খেলিয়া বা বৃথা গল্প করিয়া নষ্ট করার পরিবর্ত্তে আত্মোন্নতিতে ব্যয় করিতে লাগিলেন। পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাঠ গ্রহণ করাতেই সতীশের মাতার শিক্ষা প্রণালী নিবদ্ধ ছিল না। তিনি যাহাতে তাহাদের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জন্মে তাহাই করিতে লাগিলেন এবং আপনার স্বভাবগুণে অতি অল্প কালের মধ্যেই বিশেষ রূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। পাড়ার বৃদ্ধারা প্রথমতঃ

শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বাবু হয়ে যাবে, আর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু সতীশের মাতার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে গৃহকর্ম্ম একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রীদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে গৃহ কর্ম্ম যে কেবল গৃহস্থেরই উপকারী তাহা নহে—ইহাতে তাহাদেরও বিশেষ উপকার। যেমন শিক্ষা দ্বারা মন বলিষ্ট হয়, তেমনই পরিশ্রম দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ ও সুস্থ হয়। শিক্ষা না পাইলে মন যেমন নানা প্রকার কুচিন্তা বা অচিন্তার আধার হইয়া ক্রমে অসাড় হইয়া পড়ে, শরীরও পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঠিক সেইরূপ নানাপ্রকার রোগের আধার হয়, স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বৃদ্ধারা যখন দেখিলেন যে যুবতীরা অলস না হইয়া বরঞ্চ পরিশ্রমী হইয়াছেন, তখন তাঁহারা আর শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতেন না। বুদ্ধিবৃত্তি ও শরীর সঞ্চালনেই তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবসিত হয় নাই। নীতি শিক্ষার প্রতি তাঁহার সমধিক দৃষ্টি ছিল। নীতি বিষয়ক পুস্তক পড়াইয়া তিনি নীতি শিক্ষা দিতেন না। তিনি পাঠ্য পুস্তক হইতেই নীতি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে এরূপ ভাবে ধরিতেন যে তদ্দ্বারা পাঠ্যপুস্তক ও নীতি উভয়েরই সৌন্দর্য্য বাড়িত। এই সমস্ত শিক্ষার মূলে তাঁহার নিজের জীবন। তাঁহার জীবন দেখিয়াই সকলে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে তাঁহার মুখ দিয়া যে কথাই বাহির হইত তাহাই তাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইত।

সতীশের মাতা এই রূপে মনুষ্য সমাজের মহোপকার সাধিতে ছিলেন কিন্তু কালের নিকট সে সব বিচার নাই। ভাল মন্দ সকলই কালের স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাঁহার এক দিন হঠাৎ জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। জ্বর বিচ্ছেদ

হয় না। তিনি দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সুরবালা প্রথমেই দাদাকে সংবাদ দিবেন মনে করিলেন কিন্তু মাতার কথা মতে তাহা ক্ষান্ত দিলেন। ক্রমে ৬ দিন যায়, জ্বরের বিরাম নাই, ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে সুরবালা দাদাকে পত্র লিখিলেন। সতীশ তৎক্ষণাৎ বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারা মাতার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু চিকিৎসায় বিশেষ কোনও ফল হইল না। ক্রমে চৌদ্দ দিন কাটিয়া গেল। সতীশ শরৎকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন। শরৎ এ সংবাদ শুনিয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না। কর্ম্ম স্থান হইতে একেবারে মনোহরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সতের দিন কাটিয়া গেল। রুগ্না বুঝিতে পারিলেন যে এ যাত্রা তাঁহার আর নিস্তার নাই। তিনি আর ঔষধ সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার বাবুও তাহাতে আর বিশেষ আপত্তি করিলেন না। সতীশ বুঝিতে পারিলেন যে এই সংসারের যে এক স্নেহবন্ধনী ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইতে আর বিলম্ব নাই। একাকী বসিয়া এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুরবালা ও গিরিবালা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে ক্ষিপ্তার ন্যায় আসিয়া সতীশের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সতীশও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিন ভাই ভগিনীর অশ্রুজলে তিন জনেই স্নাত হইলেন। সতীশ তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, যে কাঁদা এখন বড় অন্যায়। তাহা হইলে মাতার বিশেষ কষ্ট হইবে। বিশেষতঃ নরেশ তাহা হইলে একেবারে পাগল হইবে। তখন তিন জনেই কাঁদিয়া অনেকটা শান্ত হইয়া মাতার নিকট গেলেন। যাইয়া দেখেন যে নরেশ ও শরৎ মাতার দুই পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহারা যাইয়াও মাতার পার্শ্বে বসিলেন।

মাতা সতীশ ভিন্ন অপর সকলকে একবার গৃহ হইতে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর তিনি সতীশকে খুব নিকটে ডাকিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ কি সুরবালাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে ?"

সতীশ। বোধ হয় সম্মত আছে। আমার বিশ্বাস যে শরৎ সুরবালাকে ভালবাসে।

রুগ্না। আমি যত দূর বুঝিতে পারি তা'তে বোধ হয় সুরবালা শরৎকে বিশেষরূপ ভালবাসে।

সতীশ। তা'দের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত।

রুগ্না। আচ্ছা, তা'দের ডাক।

সতীশ তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত। তখন রুগ্না তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা শরৎ, বিবাহ কি,—ইহা বোধ হয় তুমি এখন বুঝিতে পার। তবে এখন বল দেখি তুমি সুরবালাকে ভালবাস কি না।" এই কথা শুনিয়া শরৎ আর কথা কহিতে পারিলেন না। সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইল। চক্ষু জ্যোতি বিশিষ্ট হইল। শরীর রোমাঞ্চ হইয়া ঈষৎ কাঁপিল। সুরবালার অবস্থাও ঠিক্ একরূপ, বেশীর ভাগ কর্ণমূল পর্য্যন্ত গোলাপী রঙ্গে ছাইয়া পড়িল—ক্রমে সে বর্ণ মিলাইয়া গেল। যিনি আজীবন ভালবাসার পুজা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহার নিকট এ সমস্ত অর্থহীন নহে। তিনি ইহার প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিলেন। তখন শরতের ও সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের আর কিছুই বলিতে হইবে না। আজ হইতে তোমরা এক হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিতে থাক। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের হস্ত যোজনা করিয়া দিলেন। তাঁহারা জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন, হস্ত সেই রূপেই যোজিত রহিল।

অশ্রুজল উভয়ের গণ্ডস্থল ভাসাইয়া বহিতে লাগিল। নির্ব্বাক অশ্রু হৃদয়ের যে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাইল, ভাষার সাধ্য কি তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়!

প্রিয় পাঠক! একবার স্বর্গরাজ্যের বিবাহ দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন। এ বিবাহের পুরোহিত স্বয়ং পরমেশ্বর, আত্মার বিবাহে শাব্দিক মন্ত্রের প্রয়োজন নাই—এ বিবাহের মন্ত্র নিস্তব্ধতা, আর নির্ব্বাক অশ্রুই ইহার প্রতিজ্ঞা।

রুগ্না দিন্ দিন্ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। ডাক্তার মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যান, বলেন 'অবস্থা খারাপ।' কিন্তু তাঁহার মুখের সে প্রশান্ত ভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরকালে আস্থাবতীর মৃত্যুর সময়ে দুঃখ কি? ভয় কি? বরং আনন্দের সময়। আজ তিনি, মনে করিতে তাঁহার প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হইতেছে, প্রিয়তম স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন। সতীর এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আত্মায় আত্মায় মিলন কি সুখের! মৃত্যুকালে তাঁহার ছাত্রীরা আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত। তিনি তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কথা কহিবার শক্তি নাই। ক্রমে শরীর আরও অবসন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু ক্রমে নিমিলিত হইল। মুখ তখনও প্রসন্ন, বিষাদের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। বদন মণ্ডল হঠাৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। ওষ্ঠ প্রান্তে যেন একটু হাসি দেখা দিল। তখন ডাক্তার বাবু নাড়ী অনুভব করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, 'হ'য়ে গিয়াছে।' একথা শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের রোলে অনন্তগগন ভাসিয়া গেল। দূরস্থ প্রান্তরে তাহার প্রতিধ্বনি হইল। সকলেরই চক্ষে অশ্রুজল বহিতেছে কিন্তু সতীশ ও সুরবালার চক্ষু শুষ্ক। তাঁহাদের

দুঃখ অশ্রুজলে বাহির হইবার নহে। মস্তকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন উত্তপ্ত বাষ্প রুদ্ধ রহিয়াছে, বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। বোধ হইতেছে যেন মস্তক ও বক্ষঃ ফাটিয়া গেল। সুরবালা নরেশকে কোলে করিয়া লইলেন। এ দিকে মৃতার সৎকারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সতীশ "খৃষ্টান" বলিয়া তাঁহার মাতাকে সৎকার করিতে কেহই আসিল না। তখন সতীশ, শরৎ ও ডাক্তার বাবু তিন জনে মৃত দেহ লইয়া নিকটবর্ত্তি শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত। চিতা প্রস্তুত হইল, কাষ্ঠ সজ্জিত হইল। মৃতদেহ তদুপরি রাখিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। মুখাগ্নি করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার বলিয়া সে কাজ বাদ দিলেন। চিতাগ্নি সৈকত ভূমি আলোকিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে মৃতদেহকে ভস্মে পরিণত করিল। সতীশ দেখিলেন, যে মাতার দেহ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও কোমল বলিয়া মনে করিতেন, যে পবিত্র দেহ হইতে তাঁহার দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। সতীশ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই চিতাগ্নির দিকেই চাহিয়া রহিলেন। অগ্নি নিবিয়া গেল, তথাপি সতীশের চক্ষু সেই চিতার উপরে। চিতাগ্নি তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছে—তিনি তাহা বাহিরে দেখিতেছেন। তখন শরৎ সতীশকে ডাকিলেন। ডাক তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অবশেষে শরৎ তাহার হস্তধারণ করিয়া টানিলেন, সতীশ কলের পুতুলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার বাবু ইত্যবসরে নদী হইতে জল তুলিয়া চিতা ধৌত করিলেন। সতীশ ও শরৎ স্নান না করিয়াই গৃহে যাইতেছেন দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন 'মহাশয়, স্নান করুন। মড়ার ধোঁয়া গায়ে লাগিয়াছে, স্নান না করিলে গায়ে দুর্গন্ধ হইবে ও অসুখ হইবে।' তখন তাঁহারা স্নান করিলেন। সতীশকে যাহা করিতে বলিতেছেন তিনি তাহাই

করিতেছেন। সকলে স্নান করিয়া গৃহে গেলেন। সতীশকে দেখিয়া সুরবালা আর থাকিতে পারিলেন না। পাগলিনীর ন্যায় দাদাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। অপরাপর সকলেও রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন দ্বিগুণ রোলে আকাশ বিদীর্ণ করিল। সতীশের মুখে শব্দ নাই—কেবল অশ্রু অজস্র-ধারে পড়িতে লাগিল আর মধ্যে মধ্যে দম বন্ধ হইয়া বক্ষঃ স্ফীত হইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যদিও সতীশ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত মাতার আশ্রয়ে থাকিয়া সে অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। এখন মাতৃহীন হইয়া তিনি যেন একেবারে আশ্রয় বিহীন হইয়া পড়িলেন। পিতার শোকও নূতন আকার ধারণ করিল। এখন সমস্ত বিষয়ই তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। শরতের সহিত সুরবালার সমাজিকপ্রথানুযায়ী বিবাহ হইলে তিনি স্বামী সঙ্গে থাকিবেন। গিরিবালা ও নরেশের বাটীতে থাকা অসম্ভব। তাহাদিগকে তিনি নিজ সঙ্গেই রাখিবেন। কিন্তু বাড়ীর কি বন্দোবস্ত করেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। মাতার এত যত্নের বিদ্যালয়টির যদি কোন অংশে হীনতা হয় তাহা নিতান্ত কষ্টের কারণ। অনেক চিন্তাও পরামর্শের পর স্থির করিলেন, যে দেশে তাঁহার যে বিষয় আছে তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন ও বাকি টাকা স্কুল তহবিলেই থাকিবে। এক জন বেতন ভুক্ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত

করিলেন এবং তাঁহার নিজ বিষয়ের আয় হইতেই তাহার বেতনের বন্দোবস্ত করিলেন। যথা সময়ে স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইল। স্বীয় মাতার নামে বিদ্যালয়ের নাম করণ হইল। সরোজিনী স্কুলের ও সতীশের বিষয়াদির সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণ করিলেন।

সতীশ ও শরৎ, সুরবালা, গিরিবালা ও নরেশকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া শরতের সহিত সুরবালার ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইল। শরৎ সুরবালাকে লইয়া স্বীয় কার্য্য স্থলে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া এখন শরৎ একজন কার্য্য করিবার সঙ্গিনী পাইলেন। তথায় যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইত তাহার মূলে শরৎ ও সুরবালা। সুরবালা নিজ গৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। নিজেই সেখানে শিক্ষা বিধান করিতেন। সুরবালার পক্ষে কোথাও অগম্য স্থান ছিল না। যেখানেই দুঃখীর কথা শুনিতেন তিনি সর্ব্বাগ্রে যাইয়া তাহার দুঃখ দূর করিতে প্রাণপণে যত্ন পাইতেন। অসহায়দিগের তিনি মাতৃস্থানীয়া হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিকটবর্ত্তি স্থানে যেখানে যত দুঃখীতাপী ছিল, তাহারা জানিতে পারিল যে তাহাদের একজন বন্ধু আছেন যাঁহার নিকট যাইতে পারিলেই কষ্টের লাঘব হইবে। তিনি নিকটবর্ত্তি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে যাইয়া স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের দেশহিতকরকার্য্যের সহায় করিয়া লইলেন। তাঁহার কার্য্য তৎপরতা ও লোকহিতৈষা দেখিয়া সমস্ত লোকেই অবাক হইয়াছিল। এ সমস্ত কার্য্যে শরৎই সুরবালার প্রাণ। সুরবালা যে সব কার্য্য করিতেন তাহার অর্দ্ধেক শরতের, কারণ শরৎ

তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিলেই তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেন। শরৎ যে টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাহা হইতে আপনাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সমস্তই এই সকল দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহারা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সতীশের নিকট যাইতেন ও সকলে অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার মনোহরপুরে আসিতেন।

সতীশের যদিও আন্তরিক ইচ্ছা গ্রামে বাস করেন কিন্তু গিরিবালা ও নরেশের পড়ার অনুরোধে তাঁহাকে অগত্যা কলিকাতায়ই থাকিতে হইল। গিরিবালাকে বেথুন স্কুলে ও নরেশকে সিটিস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিনি নিজে সমাজের ক্ষত স্থান গুলি বাহির করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পুস্তকাকারে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেমন একটি রোগ হইয়া উঠিল—যুবক দেখিলেই সুবিধামত তাহার সহিত আলাপ করিতেন এবং বাটী যাইয়া যাহাতে তাঁহার কথা গুলি বিশেষ রূপ চিন্তা করে এরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাহাদিগের সহিত তিনি এক বার আলাপ করিতেন তাহারা প্রায়ই অবসর পাইলেনই তাঁহার নিকট আসিত।

আর সরোজিনী? সেই সমাজপীড়িতা, সঙ্গীবিহীনা সরোজিনী? সরোজিনী যাঁহাদিগের সহিত বাল্যকালাবধি একত্রে বাস করিয়াছেন, একত্রে বেড়াইয়াছেন, একত্রে আলাপ করিয়াছেন, দুঃখের সময় যাঁহারা সরোজিনীর একমাত্র জুড়াইবার স্থান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ অন্যত্র গমন করিয়াছেন। সরোজিনী আজ একাকিনী। যাঁহাকে সরোজিনী নিজের মাতা অপেক্ষাও ভক্তি করিতেন, যিনি সরোজিনীর স্নেহে মাতা, শিক্ষায় গুরু ও উপদেশে বন্ধু ছিলেন, তিনি আজ এ পাপ

সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। যাহারা খেলার সঙ্গী ছিলেন, যাহারা হৃদয়ের সঙ্গী ছিলেন, তাহারা সকলেই সেই বাল্যরঙ্গভুমি মনোহরপুর ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু সরোজিনীর আর যাইবার স্থান নাই। সরোজিনী সেই শূন্য মনোহরপুরেই রহিয়াছেন। যে স্থানে এক সময়ে কেবল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ছিল সে স্থান আজ শ্মশানের বিষাদ কলিমা পরিয়াছে, সংসার আজ যেন বিধবা হইয়া সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। যদিও বাতাস তেমনই বহিতেছে, পাখী তেমনই গাহিতেছে, ফুল তেমনই ফুটিতেছে, বৃক্ষপত্র তেমনই নাচিতেছে, আকাশে তেমনই ভাবে সূর্য্য উঠিতেছে, চন্দ্র হাসিতেছে, নক্ষত্র ফুটিতেছে কিন্তু সরোজিনীর চক্ষে আজ ইহার কিছুতেই সৌন্দর্য্য নাই, সমস্তই ফাঁক ফাঁক,—সমস্তই যেন প্রাণবিহীন। সরোজিনীর হৃদয়ের মধ্যে কি যেন হু হু করিতেছে; কি যেন ছিল, কি যেন নাই। প্রাণের ভিতর একটী ভয়ঙ্কর আকাশব্যাপী শূন্য হইয়াছে— তাহার ভিতর কিছুই দেখা যায় না, কেবল ধূধূ করিতেছে—শূন্য, শূন্য, কেবল শূন্য—আর নিদারুণ উত্তাপ, তাহাতে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। সরোজিনীর দুঃখ কে বুঝিবে? যাহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার পূর্ণ ঘর শূন্য হইয়া মরুভূমি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন সরোজিনীর দুঃখ কে বুঝিবে? প্রথম প্রথম সরোজিনীর আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। কি যেন অব্যক্ত দুঃখ সরোজিনীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে—মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে অশ্রুজল আসিয়া তাহার কষ্ট অনেকটা লাঘব করে। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সরোজিনীও এই নূতন কষ্টে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি শান্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন। তিনি

যুবতীদিগের শিক্ষা কার্য্য বিলক্ষণ উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেক সঙ্গিনী পাইয়া নিজের হৃদয়ের ভারও অনেকটা কমিতে লাগিল। একজন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বালিকাদিগের শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না দেখিয়া তিনি সতীশের নিকট আর এক জন শিক্ষয়িত্রী পাঠাইতে লিখিয়া দিলেন। তিনি একজন সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া দিলেন। স্কুলের কার্য্য এখন খুব ভাল রূপ চলিতে লাগিল।

সরোজিনী সতীশের মাতার শিক্ষাপ্রণালীর উপর দুইটি বিশেষ আবশ্যক সংস্কার করিলেন। প্রথম, বালক ও বালিকাদিগের একত্রে বিদ্যাভ্যাস। এক দিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আছেন; নানা প্রকার চিন্তা আসিতেছে, যাইতেছে, কেহই স্থির থাকে না। এমন সময় হঠাৎ সতীশের বাল্যকালের পত্র খানার কথা মনে পড়িল। তখনই বালক বালিকাদিগকে একত্রে পড়াইবার কথা তাহার মনে উঠিল। তিনি প্রথমে এ কথা সুরবালা ও সতীশকে জানাইলেন। তাঁহারাও ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন। তখন তিনি সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া গৃহিণীদিগের মত লওয়াইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে কর্ত্তাদিগের বিশেষ অমত হইল না। এইরূপে তিনি দ্বাদশবর্ষের অনধিকবয়স্ক বালকদিগকে বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিলেন। যেমন বালক গুলি দ্বাদশ বর্ষ পার হইতে লাগিল অমনই তাহাদিগকে অন্য স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কারণ তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক বালকদিগকে রাখিলে হিন্দু পিতারা কন্যাদিগকে আর সেখানে পাঠাইবেন না। দ্বিতীয়, বালকবালিকাদিগের ব্যায়াম শিক্ষা। এতদর্থে তিনি একটী কাজ করিলেন। সতীশদের বাগানের আয়তন কিছু বৃদ্ধি করিলেন ও নানাবিধ ফল ফুলের গাছ দিয়া পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বালক বালিকাগণ বিকালে ছুটীর পর বাগানে যাইয়া কেহ গাছের গোড়া কোপাইত, কেহ গাছের গোড়ায় মাটি দিত, কেহবা জল সেচন করিত; কেহই অলসভাবে বসিয়া থাকিত না। এ সময়ে সরোজিনী স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। বালক বালিকাগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এ সমস্ত কার্য্য করিত। ইহাতে তাহাদের সুন্দররূপ অঙ্গচালনা হইত, সুতরাং স্বাস্থ্য তাহাদের স্বাভাবিক সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। সকলেরই মুখে আহ্লাদের চিহ্ন। সকলেই সরোজিনীকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যস্ত। সরোজিনী আদর করিয়া কাহারও গাল টিপিয়া দিতেন, কাহারও স্কন্ধে আস্তে আস্তে করাঘাত করিতেন, কাহারও বা মুখচুম্বন করিতেন। বালকবালিকারা এই আদর পাইবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত। বাগানে যে সমস্ত ফল হইত, তাহা বিক্রয় করা হইত না, বালকবালিকারাই ভোগ করিত।

সরোজিনীর জীবনের কার্য্য ইহাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। রোগী দুঃখীর সেবা তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। গ্রামে কাহারও ব্যারাম হইলে সরোজিনী তাহার শিয়রে বসিয়া ঔষধ সেবন করাইতেন। অন্নাভাবে কেহ কাতর হইলে তিনি আপনার ভাত ভাগ করিয়া দিতেন। তিনি গার্হস্থ্য চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রধান প্রধান ঔষধ গুলি সঙ্গে রাখিতেন ও উপযুক্ত সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন। এইরূপে তিনি স্ত্রী সমাজের বিশেষ উপকারে আসিলেন। হিন্দু মহিলারা ব্যারাম হইলে অধিকাংশ সময় 'লজ্জা'র খাতিরে প্রকাশ করেন না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না হওয়াতে স্বাস্থ্য চির জীবনের জন্য ভঙ্গ হয় এবং তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহাদের সন্তান গুলিও অযত্নে নানা প্রকার ক্লেশ পায় এবং অনেকেই মাতার

দশা প্রাপ্ত হয়। যে গুলি জীবিত থাকে তাহারাও এরূপ অযত্নে প্রতিপালিত হইয়া জীবনের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলে এবং মনুষ্য সমাজের সুখের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা এরূপ অযত্নে প্রতিপালিত বালকবালিকা দেখিয়াছেন তাহারাই জানেন, ইহাদের সংসর্গ কিরূপ বিরক্তি জনক। সরোজিনী ইহাদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। প্রথমে নিজে চিকিৎসা করিতেন। যদি দেখিতেন যে ব্যারাম গুরুতর তখনই কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া উপযুক্ত লোক দ্বারা চিকিৎসা করাইতেন। এইরূপে অনেক স্ত্রীলোক সরোজিনীর জন্য জীবন ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া নিজেরাও সুখী হইলেন ও অপরকেও সুখী করিলেন।

সরোজিনী আরও একটি কাজ করিলেন। স্ত্রীলোকদিগের পড়িবার জন্য একটি ক্ষুদ্র রকমের পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। সতীশ ও শরতের সাহায্যে পুস্তকালয়ের কলেবর পুষ্ট হইল। তাহাতে নানাবিধ পুস্তক ও সংবাদ পত্র থাকিত। পাড়ার শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মধ্যাহ্নকালে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতেন। অনেক অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সেই সমস্ত শুনিতেন। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই একটি বঙ্গরমণী কর্ত্তৃক মনোহরপুর সুসভ্যতাও সুশিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। মনোহরপুরের শ্রী ফিরিল।

এতভিন্ন পঠন, চিন্তা এবং সুরবালা ও সতীশের পত্রই সরোজিনীর প্রধান সুখ প্রস্রবণ ছিল।

যখন মনোহরপুরের লোকেরা দেখিলেন যে এ সমস্ত উন্নতির মূলে সতীশ ও তাঁহার মাতা, তখন তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব চলিয়া গেল। যখন সতীশ ভাই ভগিনী গুলিকে লইয়া মনোহরপুরে আসিতেন তখন সকলেরই আনন্দের দিন পড়িয়া যাইত। দুই একটি নিতান্ত গোঁড়া ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ব্যতি-

রেকে সকলেই সতীশকে বিশেষ সমাদর করিতেন। সত্যের ও পবিত্রতার জয় লাভ হইল। সকলের হৃদয়ই ক্রমে উদার হইয়া আসিল। এই আনন্দের দিনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী সরোজিনী—এই কয়েকটি দিনই তাহার অন্ধকার জীবনের সুখচন্দ্র। এইরূপে একটি ক্ষুদ্র পরিবার সমস্ত গ্রামকে এক পরিবার ভুক্ত করিল। সকলকে আপনার করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আশা হয় যে এক দিন পবিত্র অন্তরে সত্যানুসরণ করিলে সমস্ত জগৎ এক পরিবারভুক্ত হইবে ভীরু সাহস কর, সত্যের জয় হইবেই হইবে। সত্যে নির্ভর কর, তোমার সমস্ত বাধা উড়িয়া যাইবে।

মনুষ্য চরিত্র চুম্বকলৌহের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। যেমন মিশ্রিত লৌহ চূর্ণ ও বালুকার মধ্য দিয়া চুম্বক লৌহ স্বাধীনভাবে টানিলে কেবল লৌহ চূর্ণ গুলিই আকৃষ্ট হইবে, এক রেণু বালুকাও আকৃষ্ট হইবে না। তদ্রূপ এই বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য সমাজের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সম প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই আকর্ষণ করিবেন, ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্র কখনই আকৃষ্ট হইবে না। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক কখনও একত্র সুখে বাস করিতে পারেনা। যে সমাজ জোর করিয়া ভিন্ন প্রকৃতির লোককে একত্র আবদ্ধ করে তাহা কখনও সুখের সমাজ হইতে পারে না। বঙ্গ সমাজের এত গৃহবিবাদ, এত অসুখের এক মাত্র কারণ এই স্বাধীনতার অভাব। বঙ্গ সমাজ হয় মনে করে, যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে জোর করিয়া একত্রে রাখিলে কালে তাহারা এক প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া যাইবে, অথবা কিছুই মনে ভাবে না। এইরূপে স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করাতেই বঙ্গ

সমাজের এত দুর্গতি হইয়াছে। যত দিন বঙ্গ সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের এ দুর্গতি কিছুতেই কমিবে না। আর যে দিন স্বাধীনতা স্বাধীন হইবে, যে দিন বঙ্গ সন্তান কেবল মাত্র সত্য ও বিবেক দ্বারা শাসিত হইবে সে দিন বঙ্গদেশের দুঃখ দূর হইবে, বঙ্গদেশ তখন সুখ সাগরে ভাসিবে। তখন বঙ্গদেশের প্রত্যেক পরিবার সতীশের পরিবারের ন্যায় সুখময়, দুঃখতাপহারী হইবে।

সম্পূর্ণ।